

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের
নির্বাচিত পোস্টে সমগ্র

২০১৭ ইমসার্বী



তায়কিয়াতুন নাফস আর্কাইভ-২০১৭

দাওয়াহ ইলান্নাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

সূচীপত্র

সাদেকীন কারা?	৪
ইবনুল কাইয়্যুম রহ.-এর আল-ফাওয়ায়েদ অবলম্বনে	৭
মন জুড়ানো মুহূর্ত	১৬
মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করার ২১ জন সাহসী ব্যক্তির উদাহরণ	২০
নিফাক মুমিন থেকে ঈমান বের করে দেয়	৩৬
আমাদের প্রতিটি কাজ হোক একমাত্র আল্লাহর জন্য	৪১
তায়কিয়াতুন নাফসঃ নিজের দ্বিনি ভাইদের প্রতি ধৈর্য ধারণ করা	৪৮
মানুষের অন্তর নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা (অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ ও প্রতিকার)কালো পতাকা আইডির একটা অনুরোধ	৫১
দিকব্রান্ত জাতির সাথে কেমন হবে আমাদের আচরণ	৬৪

সাদেকীন কারা?

[hinder mujahid](#)

Junior Member

০৪-০৬-২০১৭

সূরা তাওবার ১১৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

'হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সাদেকীনদের সঙ্গ অবলম্বন কর।'

সাধারণত আমাদের দেশের ইসলামী মুরুব্বীগণ, হক্কানী পীর সাহেবগণ এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েই আমাদেরকে তাদের সঙ্গ অবলম্বন করতে বলেন। এখন দেখার বিষয় হল, আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা সাদেকীন বলে কাদেরকে বুঝিয়েছে? আল-কুরআনে সাদেকীনদের কোনো সংস্থা বা পরিচয় পাওয়া যায় কিনা? অবশ্যই কুরআনে সাদেকীনদের সংস্থা রয়েছে। কারণ আল্লাহ তাআলা সাদেকীনদের সঙ্গ অবলম্বন করতে বলবেন আর তাদের পরিচয় দিবেন না, তা তো হয় না।

সূরা হুজুরাত এবং সূরা হাশরে আল্লাহ তাআলা সাদেকীনদের পরিচয় উল্লেখেন করেছেন। হুজুরাতের ১৫ নং আয়াতে ইরশাদ করছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. الحجرات: 15

'তরাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জ্ঞান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। তরাই সাদেকীন (সত্যনিষ্ঠ)।'

কারা গনীমতের মালের ভাগ পাবে তাদের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা সূরা হাশরের ৮ নং আয়াতে বলেন,

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. الحشر: 8

'(গণীমতের ঐ সম্পদ) দেশ ত্যাগী নিস্ব:দের জন্য যারা, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অশ্বেষণে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তু-ভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সাদেকীন (সত্যবাদী)।' আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করার অর্থ হল, আল্লাহর প্রেরিত কিতাব এবং রাসূল সা: এর আদর্শ (সুন্নাহ) বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাফেরদের সাথে জিহাদ করা। (দেখুন, তাফসীরে তবারী, সূরা মুহাম্মাদের ৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।)

আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী হওয়ার জন্য যে ধরনের সাদেকীন বা সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন করতে বলেছেন, উপরিউক্ত দুটি আয়াত থেকে আমরা তাদের নিম্নোক্ত গুণাবলী পেয়ে থাকি:

১. তারা আল্লাহ উপর ঈমান রাখে।
২. তারা রাসূল সা. এর উপর ঈমান রাখে।
৩. তারা পোখতা ঈমানদার; তাদের ঈমানে সামান্য কোনো সন্দেহ নেই।
৪. তারা আল্লাহর পথে নিজের জান দিয়ে জিহাদ করে।
৫. তারা আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ দিয়েও জিহাদ করে।
৬. তারা কুরআন-সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে।
৭. তারা দ্বীনের জন্য এত বেশি কুরবানী পেশ করবে যে, প্রয়োজনে নিজের দেশ, ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এমন জায়গায় চলে যাবে, যেখানে গিয়ে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীন পালন করতে পাববে।

আমরা যেসব শাইখগণকে সাদেকীনদের মসনদে বসিয়ে তাদের সঙ্গ অবলম্বন করে মুত্তাকী হতে চাচ্ছি, তাদের মধ্যে আল-কুরআনে বিবৃত প্রকৃত সাদেকীনদের গুণাবলী আছে কিনা তা বার বার ভেবে দেখা উচিত। যদি না থাকে তাহলে মরিচিকার পিছনে ছুট নিজের সময় নষ্ট করবেন না। প্রকৃত সাদেকীনদের

অনুসন্ধান করতে থাকুন। আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে দুআ করতে থাকুন।
পেয়ে যাবেন ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তার বান্দাকে নিরাশ করেন না।

বি.দ্র. আমি আমাদের সমাজের ইসলামী মুরব্বীগণকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাদেরকে
আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সঞ্চারিত 'সাদেকীনদের' অন্তর্ভুক্ত মনে করি না। কারণ
আমি তাদের মধ্যে কুরআনে বিবৃত সাদেকীনদের সবগুলো গুণ পাই না।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬০৩৬>

ইবনুল কাইয়েম রহ.-এর আল-ফাওয়ায়েদ অবলম্বনে

Ahmad Faruq M

Senior Member

০৪-১৫-২০১৭

মুখতাসারুল ফাওয়ায়েদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

গুরুত্বপূর্ণ কায়দা:

কীভাবে কুরআনের দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়?

তুমি কুরআনের দ্বারা উপকৃত হতে হলে কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণের সময় মনোনিবেশ করো, নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করো এবং যিনি কুরআনে তোমাকে সম্বোধন করে তোমার সাথে কথা বলছেন সে মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিতি অনুভব করো। কেননা কুরআন তোমার জন্য রাসূলের জবানে আল্লাহর সম্বোধন ও বার্তা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ৩৭]

“নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার রয়েছে অন্তর অথবা যে নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করে।” [সূরা কাফ, আয়াত: ৩৭]

কুরআনের পূর্ণ প্রভাব (উপকার বা উপদেশ) লাভ করা যেহেতু প্রভাবকারী, প্রভাব বিস্তারের স্থান, প্রভাব লাভের শর্ত ও উপকার লাভ থেকে বাধামুক্ত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল, সেহেতু উপরোক্ত আয়াতে সংক্ষিপ্তসারে কিন্তু পূর্ণাঙ্গরূপে এসব কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী, [ق: ৩৭] ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ﴾ “নিশ্চয় এতে (কুরআনে) উপদেশ রয়েছে তার জন্য।” [সূরা কাফ, আয়াত: ৩৭] সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত অংশে কুরআনের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী, [ق: ৩৭] ﴿مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ “যার রয়েছে অন্তর।” [সূরা কাফ, আয়াত: ৩৭] এটি প্রভাব (উপকার) গ্রহণের স্থান। এখানে কলব দ্বারা জীবন্ত অন্তরকে বুঝানো হয়েছে, যে অন্তর আল্লাহকে চেনে ও জানে।

যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ٦٩ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ٧٠﴾ [يس: ৬৯, ৭০]

“এ তো কেবল এক উপদেশ ও স্পষ্ট কুরআন মাত্র। যাতে তা সতর্ক করতে পারে ঐ ব্যক্তিকে যে জীবিত।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৬৯-৭০] অর্থাৎ যার অন্তর জীবিত।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী, [ق: ৩৭] ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ ٣٧﴾ “অথবা যে নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করে।” [সূরা কাফ, আয়াত: ৩৭] অর্থাৎ সে শ্রবণে মনোনিবেশ করে এবং যা কিছু বলা হয় তা কান লাগিয়ে শোনে। কথা দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার এটি অন্যতম শর্ত।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী, [ق: ৩৭] ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ ٣٧﴾ “সে অন্তরসহ উপস্থিত।” [সূরা কাফ, আয়াত: ৩৭] অর্থাৎ তার অন্তর সেখানে উপস্থিত, সে মনের দিকে অনুপস্থিত নয়।

ইবন কুতাইবা রহ. বলেছেন, “আল্লাহর কিতাব নিবিষ্টচিত্তে ও বুঝে-শুনে শ্রবণ করো, গাফিল ও অন্যমনস্ক হয়ে নয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেউ গাফিল ও অমনোযোগী হয়ে তিলাওয়াত করলে তা কুরআনের উপকার অর্জনে বাধাদানকারী হয়ে যায়। কুরআনে তাকে যা বলা হয়েছে তা না বুঝে, এতে চিন্তা-গবেষণা না করে ভুলোমন ও অমনোযোগী হয়ে পড়লে কুরআন উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।

অতএব, প্রভাববিস্তারকারী (কুরআন) যখন প্রভাববিস্তারের স্থান (অর্থাৎ জীবন্ত অন্তর), প্রভাব বিস্তারের শর্ত (অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ), প্রভাববিস্তারে

বাধামুক্ত (তথা অন্তরকে কুরআনের সম্বোধন অনুধাবনে ব্যস্ত রাখা ও অন্য কাজ থেকে বিরত থাকা) সবকিছু একত্রে অর্জিত হলে কুরআনের প্রভাব তথা উপকার ও উপদেশ অর্জিত হবে।

এ সূরাতে ঈমানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলনীতি সন্নিবেশিত হয়েছে যা ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট এবং অন্য কিছু থেকে তাকে অমুখাপেক্ষী করে। কেননা এতে সৃষ্টির শুরু, পুনরুত্থান, তাওহীদ, নবুওয়াত, ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান, মানুষকে সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান দুদলে বিভক্ত করা এবং এ দু’দলের বিবরণ আলোচনা করা হয়েছে।

- এতে দু’টি কিয়ামত তথা কিয়ামতে সুগরা (ছোট কিয়ামত তথা মৃত্যু) ও কিয়ামতে কুবরা (বড় কিয়ামত বা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

- দুটি আলাম (জগতের) তথা বড় জগত বা আখিরাত ও ছোট জগত বা দুনিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

- মানব সৃষ্টি, তাদের মৃত্যু, পুনরুত্থান, মৃত্যুর সময় তাদের অবস্থা, হাশরের দিনের অবস্থা, সবকিছু সবদিক থেকে আল্লাহর বেষ্টিত; এমনকি তাদের অন্তরের ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) পর্যন্ত তাঁর জ্ঞাত থাকা, মানুষের ওপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করা, তারা যা কিছু বলে সব কিছুই সংরক্ষণ করে রাখা; আর কিয়ামতের দিন তিনি তাকে যথাযথ পুরস্কার প্রদান, সেদিন সে উপস্থিত হবে, তার সাথে থাকবে একজন চালক, যিনি তাকে আল্লাহর দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন, আরও থাকবে একজন সাক্ষী, যিনি তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন।

যখন তার চালক তাকে উপস্থিত করবে তখন সে বলবে,

﴿هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ﴾ [ق: ২৩]

“এই তো আমার কাছে (আমল নামা) প্রস্তুত।” [সূরা কাফ, আয়াত: ২৩]

অর্থাৎ এ আমলনামা প্রস্তুত করতে আমি আদিষ্ট ছিলাম, আজ আমি তা প্রস্তুত করেছি। আমলনামা উপস্থিত করলে তাকে বলা হবে,

﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلٌ كَفَّارٌ عَنِّي﴾ [ق: ২৪]

“তোমরা জাহান্নামে নিক্ষেপ করো প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে।” [সূরা কাফ, আয়াত: ২৪] যেভাবে অপরাধীকে বাদশার সামনে উপস্থিত করে বলা হয়, অমুককে আমি তার কৃতকর্মসহ উপস্থিত করেছি, তখন বাদশা বলেন, তাকে জেলখানায় নিয়ে যাও এবং তার অপরাধ অনুযায়ী তাকে শাস্তি দাও।

গুরুত্বপূর্ণ ফায়োদা:

আল্লাহ জমিনকে মানুষের উপকারার্থে নিয়োজিত করে দিয়েছেন

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ
الْنُّشُورُ﴾ [المالك: ১৫]

“তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ করো এবং তাঁর রিযিক থেকে তোমরা আহার করো। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৫]

আল্লাহ এ আয়াতে বলেছেন, তিনি জমিনকে মানুষের জন্য সুগম করে দিয়েছেন, তাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন যাতে তারা তাতে হাঁটতে পারে, খনন করতে পারে, ফাটাতে পারেন ও এর উপর ঘর-বাড়ি বানাতে পারেন। তিনি জমিনকে এমন কঠিন ও অনুপযোগী করেন নি, যাতে কেউ এতে আবাদের কাজ করতে চাইলে তা বাধাগ্রস্ত হয়।

এ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা‘আলা জমিনকে অনুগত উটের ন্যায় অনুগত ও সুগম করে দিয়েছেন, যাতে জমিনকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কাজে লাগানো করা যায়। মানাকিব্বিহা (مناكيبها) বা জমিনের ঘাড় বলে, পথ-প্রান্তর ও সক্ষীর্ণ উপত্যকাকে বুঝানো অতীব সুন্দর বলে বিবেচিত হয়েছে*; কারণ এর আগে সেটাকে সুগম বলা হয়েছে। সুতরাং এসব পথ-প্রান্তর ও সক্ষীর্ণ উপত্যকার ওপর পায়ে হেঁটে চলাচলকারী যেন এর ঘাড়ের উপর দিয়েই চলেছে। কারণ মানুষের মানাকিব্ব তথা ঘাড় হলো তার সর্বোচ্চ স্থান। আর তাই মানাকিব্ব শব্দের ব্যাখ্যা

কেউ কেউ পাহাড় করেছেন; যা মানুষের ঘাঁড়ের ন্যায়; যার অবস্থান তার সর্বোপরে।

কেউ কেউ বলেছেন, এতে এ কথার প্রতিও সতর্ক ইঙ্গিত রয়েছে যে, জমিনের সহজতর স্তরে (সমতলে) চলা মানাকিবে (পথ-প্রান্তর ও সন্ধীর্ণ উপত্যকায়) চলার চেয়ে অধিকতর সহজ।

আরেকদল বলেছেন, মানাকিব (مناكب) হলো, পার্শ্ব ও কিনারা। যেমন (مناكب) মানুষের পার্শ্বদেশকে মানাকিব বলা হয়। (الإنسان لجوانبه)

আমার মতে, মানাকিব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উপরিভাগ। এ হিসেবে জীব-জন্তু জমিনের উপরিভাগে চলাচল করে, এর নিম্নভাগে চলাচল করে না। কেননা ভূ-পৃষ্ঠের ছাদ হলো উপরিভাগ। আর চলাচল করে উপরিভাগে। মানাকিবকে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ বলে ব্যাখ্যা করা উত্তম, যেহেতু এর গুণ বর্ণনায় বলা হয়েছে এটি সুগম।

অতএব, এ আয়াতে কারীমা আল্লাহর রুবুবিয়াত, একত্ববাদ, কুদরত, হিকমত ও তাঁর সূক্ষ্ম সৃষ্টির প্রমাণ, তার নি‘আমত ও ইহসানের স্মরণ, দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে যাওয়া ও একে স্থায়ী আবাস বানানো হতে সতর্কতা; বরং জাহ্নামের দিকে এগিয়ে যেতে দুনিয়াতে অতিক্রম চলা ইত্যাদি शामिल করেছে। আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা, তিনি এ আয়াতে তাঁর পরিচয়, তাঁর তাওহীদ, তাঁর নি‘আমতের স্মরণ, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন, তাঁর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি, তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া, তাঁর ঘোষণা তিনি এ দুনিয়াকে এমনভাবে গুটিয়ে নিবেন যেন তা আগে ছিলো না, এ দুনিয়ার অধিবাসীদেরকে মৃত্যুর পরে পুনঃজীবিত করবেন এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ফায়েদা: মানুষের সৌভাগ্যের কারণসমূহ

মানুষের দু’ধরনের শক্তি রয়েছে। চিন্তা ও তত্ত্বগত জ্ঞান সম্বলিত শক্তি (قُوَّةٌ عِلْمِيَّةٌ) এবং ইচ্ছা ও কর্মগত শক্তি (قُوَّةٌ عَمَلِيَّةٌ اِرَادِيَّةٌ)। মানুষের জ্ঞানগত ও ইচ্ছাগত শক্তির পূর্ণতার ওপরই তার পরিপূর্ণ সৌভাগ্য নির্ভর করে।

* আর মানুষ কর্তৃক তার সৃষ্টিকর্তাকে জানা, তাঁর নাম ও গুণাগুণসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া, যে পথে তাঁকে পাওয়া যায় সে পথ জানা, তার নিজের পরিচয় জানা ও নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ইলমী শক্তি পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং সর্বাধিক বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোক সে ব্যক্তি যে এগুলোর পরিচয় লাভ করে এবং এ গুলো সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখে।

* আর মানুষ কর্তৃক তার ইচ্ছা ও কর্মগত শক্তি তখনই অর্জন করবে, যখন সে তার রবের হকসমূহ যথার্থভাবে রক্ষা করবে, এ হকসমূহ ইখলাস, সততা, একনিষ্ঠতা, ইহসান ও অনুসরণের সাথে পালন করবে, তার ওপর তার রবেব অনুগ্রহসমূহের সাক্ষ্য দিবে, তাঁর হকসমূহ আদায়ে নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করবে, তার দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার জন্য সে অত্যন্ত লজ্জিত হবে। কেননা সে জানে যে, তার যতটুকু ইবাদত-বন্দেগী করা উচিত সে ততটুকু পালনে অক্ষম, নিতান্ত কম হকই সে আদায় করছে, অনেক অনেক কমই সে আদায় করছে।

বস্তুত তাঁর সাহায্য ব্যতীত এ দু'শক্তি পরিপূর্ণ করা অসম্ভব, সে সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সরল সঠিক পথের হিদায়াত প্রাপ্ত হতে একান্তভাবে নিরুপায় হয়ে তার সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল, যে পথ তিনি তাঁর অলী ও বিশেষ প্রিয়জনকে পরিচালিত করেছেন। অনুরূপভাবে সে সরল সঠিক পথ থেকে বেরিয়ে আসতে হয় এমন কাজ থেকে তাকে যেন বাঁচতে পারে (এতেও তার সাহায্যের উপর নির্ভরশীল)। হয় তার ইলমী বা জ্ঞানগত শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে, ফলে সে পথভ্রষ্ট হবে অথবা তার আমলী বা কর্মগত শক্তি বিনষ্ট হবে, ফলে তার ওপর আল্লাহর রাগ অত্যাৱশ্যকীয় হয়ে যাবে।

বস্তুত উপরোক্ত জিনিসগুলো অর্জিত না হলে মানুষের পূর্ণতা ও তার সৌভাগ্য কখনও পরিপূর্ণ হবে না। সূরা ফাতিহায় এ সব কিছু খুব সুন্দরভাবে ও পরিপূর্ণ সুশৃঙ্খল-রূপে একত্রিত হয়েছে।

সূরা ফাতিহার শুরুতে আল্লাহর রহমত, মধ্যভাগে তাঁর হিদায়াত ও শেষভাগে তাঁর নি'আমতের কথা আলোচিত হয়েছে। আল্লাহর হিদায়াত লাভের অংশ অনুযায়ী বান্দা তাঁর নি'আমত লাভ করবে, আবার তাঁর রহমত লাভের অংশ অনুযায়ী সে তাঁর হিদায়াত লাভ করবে। সুতরাং সব কিছুই তাঁর নি'আমত ও

রহমতের মধ্যেই ঘূর্ণায়মান। আর রহমত ও নি‘আমত আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের আবশ্যকীয় গুণ। অতএব, যিনি রব হবেন তিনি রহমতদানকারী ও নি‘আমতদানকারী না হয়ে পারেন না। আর এ গুণগুলো আল্লাহর উলুহিয়াত বা তাঁর ইলাহ হওয়াকে বাধ্য করে। সুতরাং তিনিই সত্য ইলাহ, যদিও অস্বীকারকারীরা অস্বীকার করে এবং মুশরিকরা তাঁর সাথে শির্ক করে।

অতএব, যার মধ্যে সূরা ফাতিহার সম্পূর্ণ অর্থ জ্ঞানগত, পরিচিতিগত, কর্মগত ও অবস্থাগতভাবে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে সে-ই পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করবে, তার উবুদিয়্যাত বা দাসত্ব হবে আল্লাহর নি‘আমতপ্রাপ্ত বিশেষ লোকদের দাসত্বের মতো, যাদের মর্যাদা সাধারণ ইবাদতকারীদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহই সাহায্যকারী।

ফায়েদা: কীভাবে তোমার রবকে চিনবে?

আল-কুরআনে মহান রব দু’টি উপায়ে তাঁকে চেনার জন্য বান্দাদেরকে আহ্বান করেছেন। সে পদ্ধতি দু’টি হলো:

প্রথমত: তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ও গভীরভাবে তাকানো।

দ্বিতীয়ত: তাঁর আয়াতসমূহে চিন্তা ও সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা; তন্মধ্যে প্রথম প্রকার হলো তাঁর দৃশ্যমান আয়াত বা নিদর্শন আর দ্বিতীয় প্রকার হলো বিবেকগ্রাহ্য শ্রবণযোগ্য আয়াত বা নিদর্শন।

প্রথম প্রকারের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآلْفُلِكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ۖ﴾ [البقرة: ১৬৬]

“নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে, সে নৌকায় যা সমুদ্রে মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তু নিয়ে চলে (রয়েছে নিদর্শনসমূহ এমন জাতির জন্য, যারা বিবেকবান)।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৪] এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ ١٩٠﴾

[আল عمران: ১৯০]

“নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য বহু নিদর্শন।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯০] এ জাতীয় আয়াত আল-কুরআনে অনেক রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَاءَانَ ۝ ٢٤﴾ [محمد: ২৪]

“তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না?” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ ۝ ٦٨﴾ [المؤمنون: ৬৮]

“তারা কি এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না?” [সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ৬৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِّيَذَّبَرُوا ۝ ٢٩﴾ [ص: ২৯]

“আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে।” [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৯] এ ধরনের অনেক আয়াত রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿سَأْتِيهِمْ ءَايَاتُنَا فِي آَلَافٍ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ ٥٣﴾ [فصلت:

[৫৩

“বিশ্বজগতে ও তাদের নিজদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কুরআন) সত্য।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৫৩] অর্থাৎ আল-কুরআন সত্য। এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে তার দৃশ্যমান সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখাবেন যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, তিলাওয়াতকৃত এ কুরআন সত্য।

তারপর তিনি তাঁর দেওয়া সাক্ষ্যকেই তার পক্ষ থেকে আগত সকল সংবাদের সত্যতার জন্য যথেষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন, কারণ; তিনি তাঁর রাসূলগণের সত্যতার ওপর যাবতীয় দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অতএব, আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহ তাঁর সত্যতার প্রমাণ, আর আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং তাঁর রাসূলগণের আয়াতসমূহের সত্যতার ওপর প্রমাণ। তিনি নিজেই সাক্ষী ও সাক্ষ্য সাব্যস্তকৃত (সত্তা)। আর তিনি নিজেই প্রমাণ ও নিজের ওপর প্রমাণবহ। তিনি নিজেই নিজের জন্য দলীল। যেমন কোনো এক বিজ্ঞলোক বলেছেন, ‘কীভাবে আমি তাঁর (আল্লাহর) প্রমাণ তালাশ করবো যিনি নিজেই আমার কাছে সব কিছুর জন্য প্রমাণ? তাঁর ব্যাপারে যে দলীলই তালাশ করি, তাঁর অস্তিত্ব সে গুলোর চেয়ে অধিক স্পষ্ট।’

এ কারণেই রাসূলগণ তাদের জাতির কাছে বলেছিলেন,

﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾ [ابراهيم: ১০]

“(তাদের রাসূলগণ বলেছিল), আল্লাহর ব্যাপারেও কি সন্দেহ?” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১০] তিনি তো সব জ্ঞাত বিষয়ের চেয়ে অধিক জ্ঞাত, সব দলিলের চেয়ে অধিক স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সব বস্তু তাঁর (আল্লাহর) দ্বারাই চেনা যায়, যদিও তাঁর কাজসমূহ ও হুকুমের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও দলীল-প্রমাণ তালাশের মধ্যেও তাঁকে চেনা যায়।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬২৩৪>

মন জুড়ানো মুহূর্ত

বাবর আহমেদ, যুক্তরাজ্য কারাগার।

[topu ahmed](#)

Senior Member

০৪-৩০-২০১৭

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল কুরআনে বলেন:

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ। যারা বিনয়-নশ্র নিজেদের নামাজে।” (২৩:১-২)

এবং

“তোমরা নামাযসমূহ ও মধ্যবর্তী নামাযের (আসর) ব্যাপারে যত্নবান হও এবং বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হও।” (২:২৩৮)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “সালাত ইসলামের খুঁটি”।

আল-মিরাজের দিনে রাসূলুল্লাহকে (সা) আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের যে আদেশ দান করেছিলেন, তা ছিল তাঁর এবং সমগ্র উম্মাহর প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে এক অসামান্য উপহার! সালাতকে কখনোই আমরা এভাবে দেখতে পারব না যে সালাতের দ্বারা আমরা আল্লাহকে ‘পুরস্কৃত’ করছি বা কোনরূপ প্রতিদান দিচ্ছি। কেননা আমাদের পক্ষে আল্লাহকে প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়, না সালাতের সাহায্যে, না অন্য কোন কাজের মাধ্যমে। বরং সালাতের বিধান দেওয়া হয়েছে যেন আমরা এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারি। সালাত কেবল ইসলামের একটি খুঁটি কিংবা একটি ফরয দায়িত্ব থেকেও বেশি কিছু: এটি আপনার সাথে গোটা বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তা’আলার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম।

সালাতকে একটি ‘হটলাইন’ এর সাথে তুলনা করা যায় যা দিয়ে আপনি যেকোন সময় আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এজন্য সালাফগণ বলতেন “যদি আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলতে চান, তাহলে সালাত আদায় করুন আর যদি আপনি চান আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলুক, তাহলে কুরআন পড়ুন”। সালাত

হলো যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্তির পথ, অস্থিরতায় প্রশান্তি। এটি আপনাকে স্বস্তি দেবে, শান্ত করবে, আস্থা যোগাবে। সালাতের মাধ্যমে আপনি যেকোনো বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য চাইতে পারবেন – হোক তা যুদ্ধের মত গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় অথবা রান্না বা কাপড়ের দাগ তোলার মত তুচ্ছ কোন কাজেও! সালাত যে কোন বিষয়ে আল্লাহর দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ পাওয়ার উপায়। লোকে সঙ্গ পেতে বা বিনোদনের খোঁজে অনেক সময় এমনিতেই টেলিভিশন বা রেডিও ছেড়ে রেখে দেয়, হয়তো সে শুনছেও না বা দেখছেও না। নিঃসন্দেহে সালাহ এসব “সঙ্গের” চাইতে উত্তম সঙ্গ দান করে।

সালাত আপনাকে সুযোগ করে দেয় আল্লাহর সামনে অন্তরটা মেলে ধরবার, তাঁর কাছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল খোঁজার। লম্বা সফরের পর, বা কোন বিপদে পড়লে, অথবা অসুস্থতায় কিংবা পথ হারিয়ে যাবার পর ফিরে আসতে পেরে সন্তান যোভাবে বাবার বুকে পরম নির্ভরতায় আশ্রয় নেয়, সালাতও তেমনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় পাবার মাধ্যম। আল্লাহর দয়া ও ক্ষমতার মাঝে হৃদয়ের প্রশান্তি খুঁজে পাবার মাধ্যম। সালাতের উপকারিতার শেষ নেই, তবে তা পেতে হলে আপনাকে এর জন্য দাম দিতে হবে, এবং তাতে বিনিয়োগ করতে হবে।

আপনার সালাতকে মনে করুন একটি ঘোড়ার মত। যখন আপনার ঘোড়ার বয়স অল্প, তখন আপনি না এতে চড়তে পারেন, না পারেন অন্য কাজে ব্যবহার করতে। কিন্তু আপনি যদি একে ভালোভাবে দেখাশোনা করেন, প্রতিদিন পরিষ্কার করেন, প্রশিক্ষণ দেন, খাওয়া-দাওয়া ও যথাযথ পরিচর্যা করেন, এর ওপর খরচ করে একে বড় করতে থাকেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে কাজটি কষ্টসাধ্য হলেও এই ঘোড়াটিই একসময় পরিণত হয়ে আপনার জন্য এক শক্তিশালী, বিশ্বস্ত ও বাধ্য ঘোড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। যখনই আপনার প্রয়োজন হবে, এটি আপনার খেদমতে হাজির থাকবে। সফরে, যুদ্ধে কী বিপদ থেকে পালাতে যখনই দরকার পড়বে আপনি এর পিঠে চড়তে পারবেন।

অনুরূপ আপনার সালাত। আপনার সালাত যখন দুর্বল, অল্পবয়সী ও অপরিণত, তখন সেটাকে বোঝার মত মনে হবে। প্রথম প্রথম সালাতের জন্য এ কাজগুলো করা খুব কঠিন মনে হবে: ওয়ূ করা, সময়মত আদায় করা, অর্থ-না-জানা সূরাগুলো মনযোগ দিয়ে পাঠ করা ও মুখস্থ আওড়ে যাওয়া, কিংবা ব্যস্ততা বা

ক্লাস্তির মাঝেও সালাত আদায় করা ইত্যাদি। তবে আপনি যদি লেগে থাকেন, অনেক চেষ্টা করেন, তাহলে চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে আপনার সালাতই আপনাকে সাহায্য করবে। সালাত আপনাকে দেবে অন্তরের প্রশান্তি, স্থিরতা, দৃঢ়তা, শক্তি, সুখ, আশাবাদ ও সাহস। আর কেবল তখনই আপনার সালাত আপনার বোঝা হবার পরিবর্তে পরম উপভোগ্য বিষয়ে পরিণত হবে।

কিছু লোক অভিযোগ করে যে তারা বছরের পর বছর সালাত আদায় করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সালাত তাদের কোন উপকারে আসে নি! বাস্তবতা হলো – সালাত তাদেরকে উপকার করতে ব্যর্থ হয় নি, বরং তারাই ব্যর্থ হয়েছে সঠিকভাবে সালাত আদায় করতে। সালাত আপনাকে কখনোই ব্যর্থ করবে না যদি না আপনি প্রথমে সালাতকে ব্যর্থ করে দেন। ভেবে দেখুন, আপনি কি এমন একজন যার কাছে সালাত উপভোগ্য নয়, বরং বোঝা স্বরূপ? যদি তা-ই হয়, সালাতের আগে পরে নিজের কাজের প্রতি লক্ষ্য করুন। আপনি কি তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করতে যান? কোনরকমে সালাত আদায় করেন যাতে করে যতো দ্রুত সম্ভব সালাত থেকে উঠে চলে আসতে পারেন? ভাবুন, সালাতের মাঝে কি আপনি তড়িঘড়ি করেন? সালাম ফেরানোর পরেই চট করে উঠে পড়েন? এই ব্যাপারগুলো যদি ঘটে থাকে, তাহলে বলা যায় যে আপনি সালাত থেকে উপকৃত হচ্ছেন না।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা সূরা বাক্বারায় বলেন:

তোমরা নামাযসমূহ ও মধ্যবর্তী নামাযের (আসর) ব্যাপারে যত্নবান হও এবং বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হও। (২:২৩৮)

সুতরাং ধীরেসুস্থে সালাতের দিকে যান, শান্তভাবে সালাত আদায় করুন। তাহলেই আপনি শান্তি পাবেন। আপনার মন যদি সারা দিনের কাজকর্ম ও চিন্তার জগতে ঘুরপাক খায়, তাহলে একটু সময় নিন একে শান্ত করতো। আপনার অস্থির মনকে ভাবুন এক কাপ চায়ের মত, যা চামচ দিয়ে নাড়া দেওয়া হয়েছে। চামচ সরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথেই এটি থেমে যায় না, একটু সময় নেয়। একইভাবে, সালাত আদায় করার আগে যা করছিলেন, সে সব কাজ বন্ধ করে একটু শান্ত হয়ে বসুন। প্রয়োজন থাকলে প্রাকৃতিক কাজ সেরে নিন, তারপর সুন্দর করে ওয়ূ করুন। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে নিন ও কাপড় পরিচ্ছন্ন কিনা দেখে নিন। শত হোক,

আপনি কিছুক্ষণের মাঝে নিজেকে বিশ্বজগতের মালিকের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন!

- আযান দিন, যদি ইতিমধ্যে দেওয়া না হয়ে থাকে, তারপর সুন্নাহ সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ান।
- সুন্নাহ আদায়ের পর সালাতের স্থানে বসেই কিছু যিকির করুন।
- যখন আপনি নিশ্চিত বোধ করবেন এবং ফরয সালাতের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হবেন, তখন দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করুন। ধীরে ধীরে, সালাতের প্রতিটি কাজের মাঝে যথেষ্ট পরিমাণ সময় নিয়ে সালাত আদায় করুন। শারীরিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে প্রশান্ত অবস্থাতেই কেবল ফরয সালাত আদায় করুন।
- সালাত শেষ হয়ে গেলেই উঠে দৌড় দিবেন না, একটু সময় নিয়ে সালাহ-পরবর্তী যিকির আদায় করুন।

যখন আপনি আপনার সালাতে প্রচুর সময় ও শ্রম দিতে শুরু করবেন, তখনই আপনার জন্য সালাত বোঝা হবার বদলে আনন্দের ক্ষণ হয়ে দাঁড়াবে। সালাতে দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেও তখন আপনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না। আপনি এক ওয়াক্ত সালাতের পর পরবর্তী ওয়াক্তের জন্য অধীর হয়ে থাকবেন এবং ওয়াক্ত হওয়া মাত্র আদায় করে ফেলবেন। সালাতরত অবস্থায় আপনার মনে হবে যদি এ সালাত সারাজীবন ধরে চলতে থাকতো, আর কখনো শেষ না হতো! এ পর্যায়ে পৌঁছে সালাতের গুরুত্ব আপনার কাছে খাওয়া, পান করা ও যেকোনো বিনোদনের চেয়ে বেশি দামী মনে হবে, আপনি সালাত ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতেও পারবেন না। আর সে সময়েই আপনার কাছে সালাতকে মনে হবে সেই সবল সূঠাম ঘোড়ার মতো, যার পিঠে যখন ইচ্ছা তখনই চড়ে যাওয়া যায়।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৫১৯>

মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করার ২১ জন সাহসী ব্যক্তির উদাহরণ

কালো পতাকা

Senior Member

০৪-২৯-২০১৭

২২৪ আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, “একজন দুর্বল মুমিন অপেক্ষা একজন শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়’। (মুসলিম)

২২৫ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়শই দুয়া করতেন, “ইয়া আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা ও দুঃখবোধ থেকে; উদাসীনতা ও অলসতা থেকে; কাপুরুষতা, কৃপণতা এবং বার্ষক্যের চরম পর্যায়ে থেকে, এবং আরও আশ্রয় চাই কবরের আযাব হতে’ (বুখারী-মুসলিম)

লক্ষ্য করুন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে গিয়ে দুশ্চিন্তা এবং দুঃখবোধ দুটি বিষয়কে একত্রিত করেছেন। দুশ্চিন্তা হচ্ছে এমন কিছু কারণে ভীত হওয়া যা এখনো আসেনি, ভবিষ্যতে আসতে পারে, আর দুঃখবোধ হচ্ছে অতীতে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা, যা চলে গেছে তার কারণে মন খারাপ করে থাকা, বিষণ্ণতা। কাজেই, একজন মুসলিম সে বিষয় হতে পারে না, হোক সে ঘটনা অতীতের কোন কিছু কিংবা ভবিষ্যতের। এবং তিনি আরও একত্রিত করেছেন, উদাসীনতা ও অলসতাকে। কারণ, উদাসীনতা হচ্ছে মানসিক অকর্মণ্যতা, আর অলসতা হচ্ছে দৈহিক অকর্মণ্যতা। তিনি একত্রিত করেছেন, কৃপণতা ও কাপুরুষতাকে; কৃপণতা হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সংকীর্ণতা অনুভব করা, আর কাপুরুষতা হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেকে, নিজের আত্মাকে বিলিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সংকীর্ণতা অনুভব করা।

কিভাবে ভয়কে জয় করবেনঃ

কাপুরুষতা হচ্ছে সাহসিকতার বিপরীত। সাহসিকতা হচ্ছে অন্তরের দৃঢ়তা। আর মানুষের অন্তর বা কলব হচ্ছে সকল ভালো কাজের উৎস, আর অন্তর দৃঢ় থাকতে

পারে না যদি মন সুস্থ না থাকে। যদি অন্তর দুর্বল হয় তাহলে এটা কাপুরুষতার দিকে নিয়ে যায়, আর যদি অন্তর বেশি কঠিন হয় তাহলে তা মানুষকে বেপরোয়া করে তুলে।

কাপুরুষদের কাপুরুষতা দূর করার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হল ভয়ের কারণকে দূর করা। কি কারণে সে ভীত, সেই কারণকে খুঁজে বের করে তা দূর করা। যদি ভয়ের কারণ হয় অজ্ঞতা, তাহলে অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে ইলম অর্জন করা। যদি অজানা কোন কিছুর ভয়ে কেউ ভীত হয়, তাহলে তা দূর করার উপায় হচ্ছে সেই পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করা, অজানা বিষয়কে বা পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার মাধ্যমে একটি অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, ফলে সে বিষয়টি আর নতুন বা অজানা থাকে না।

আমরা দেখেছি, জনতার সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুরুর দিকে অনেকেই একটি ভীতিতে আক্রান্ত হন, কিন্তু বার বার এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মাধ্যমে এই অজানা ভীতি দূর হয়ে যায়। অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই অজানা বিষয়ের ভীতির প্রতিষেধক। আমরা দেখেছি, যখন কোন একজন ব্যক্তি প্রথমবারের মত রাজা বা প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাত করে, তারা সেই আয়োজনকে ভয় পায়, তাদের জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসে, এবং বডি ল্যাংগুয়েজ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর কারণ হচ্ছে, একটি অজানা নতুন পরিস্থিতির কারণে উদ্বেগ। কিন্তু, যদি সেই ঘটনাটি বারবার ঘটতে থাকে তাহলে সেই বিষয় থেকে ভয় চলে যায়। মানুষের অরিজিনাল স্বভাব বা ন্যাচার পরিবর্তন করা সম্ভব।

প্রমাণ হিসেবে এই উদাহরণটিই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি যে, একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশু (সার্কাস বা অন্যান্য ট্রেনিং যেখানে সাপের খেলা দেখানো হয়) একটি বড় সাপ দেখে ভয় পায় না, কিন্তু একজন সাহসী যুবকও ভয় পেতে পারে, আবার সেই একই শিশুটি হয়তো একটি ব্যাং দেখে ভয় পেতে পারে, কারণ সে এভাবে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়। সে হয়তো আগে কখনো ব্যাং দেখেনি। অরিজিনাল ন্যাচার বা আদি স্বভাব পরিবর্তনের একটি ভালো উদাহরণ হলো, বন্য পশুকে পোষ মানানো, বন্য পশুকে পোষ মানানোর মাধ্যমে তার স্বাভাবিক ন্যাচারকে পরিবর্তন করা যায়, এর জন্য প্রশিক্ষণ দরকার। একটা নেকড়ে ভেড়ার সাথে খেলা করতে পারে, বিড়াল পারে ইদুরের সাথে খেলতে, কুকুর বিড়াল

একসাথে থাকতে পারে; যদি তাদের স্বভাবের বিপরীতে তারা আচরণ করতে পারে, অথচ এগুলো তো তাদের আদি স্বভাবের বিপরীত !

এখন, একটা পশু যদি তার নিজের স্বভাব প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারে, তাহলে মানুষ কেন পারবে না?

একটি দৃঢ়চেতা অন্তর বিজয়ের দিকে নিয়ে যায়। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, ‘কিভাবে আপনি আপনার শত্রুদের পরাজিত করেন?’ তিনি বলেছিলেন, ‘যখন আমি আমার শত্রুর সাথে মোকাবেলা করি, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নেই যে, আমিই তাকে পরাজিত করব, আর যখন সেও বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, আমি তাকে পরাজিত করব, তখন আমার এবং তার উভয় সত্তা আমাকে সাহায্য করে, তার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে ’

কেউ কেউ এই উপদেশ দিয়ে থাকেন, ‘বিজয়ের উপর বিশ্বাস রাখ, তুমিই হবে বিজয়ী’।

অন্যেরা বলেন, ‘তুমি যদি তোমার শত্রুকে ভয় পাও, তাহলে তুমি নিজেই তোমার অন্তরে এক বিশাল বাহিনীকে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিলে’।

আমরা দেখেছি, যারা নিজেদের সাহসিকতার কারণে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের থেকে যারা ভয়ের কারণে মৃত্যু বরণ করেছে তাদের সংখ্যাই বেশি ।

আল তারতুসী বলেন, সাহস তিন প্রকার;

১- এমন ব্যক্তি যে বিপক্ষ দলের সামনে দাঁড়িয়ে আহ্বান করে একজন প্রতিপক্ষের জন্য যে বের হয়ে আসবে এবং তাঁর সাথে লড়বে।

২ এমন ব্যক্তি যে শান্ত থাকে, মনোযোগী থাকে, প্রশান্ত থাকে যখন যুদ্ধ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। আর যখন বাকিদেরকে ভয় গ্রাস করে নেয়, তখনো সে তার অবস্থান হারায় না, দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, এবং এমনভাবে আচরণ করে যা প্রমাণ করে সে নিজের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে।

৩ এমন ব্যক্তি যখন সে দেখে বাকি সবাই পরাজিত হয়েছে, এবং পিছু হটছে, তখন সে দৃঢ় থাকে এবং তাদেরকে আহ্বান করে, তাদেরকে উৎসাহ দেয় এবং লড়াই চালিয়ে যেতে বলে।

আল তারতুসী বলেন, তৃতীয় ব্যক্তিই হল সবার চেয়ে বেশি সাহসী।
মূলঃ শাইখ ইবন নুহাস(মৃত্যু ৮১৪ হিজরী) এর মাশারী আল আশউয়াক্ব ইলা
মাশারী আল-উশাক্ব , অধ্যায় ১৫

এই উন্মত্তের সাহসী ব্যক্তিদের উদাহরণ

এই উন্মত্তের ২১ জন সাহসী ব্যক্তিদের উদাহরণঃ

মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সাহসী ব্যক্তি হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম। তিনি সবচেয়ে সাহসী অন্তরের মানুষ ছিলেন, সবচেয়ে কঠিন অবস্থাগুলো
তিনি মোকাবেলা করেছেন। যখন তিনি দৃঢ়তা প্রদর্শন করতেন এরপর তার পাশে
এসে অন্যান্য বীর যোদ্ধারা দাঁড়াত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের
ময়দানে কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি।

২২৬ বুখারী এবং মুসলিমে আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন, ‘আল্লাহর রাসূল
লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বেশি
দয়ালু এবং সবার চেয়ে বেশি সাহসী’

২২৭ আলী রা) বলেন, ‘যখন যুদ্ধের ময়দানে লড়াই ভয়াবহ আকার ধারণ
করতো এবং এর চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যেত, চোখ লাল হয়ে যেত (ময়দানের
ধূলাবালির কারণে) তখন আমরা এসে রাসূলুল্লাহর পিছনে আশ্রয় নিতাম।
আমাদের মধ্যে তিনিই শত্রুদের সবচেয়ে নিকটে থাকতেন (মুসলিম) ’

২২৮- এক ব্যক্তি বারাহ বিন আযিবকে প্রশ্ন করলো, ‘কখনো কি আপনি ময়দান
থেকে পলায়ন করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে?’
তিনি বলেন, ‘আমরা করেছি, কিন্তু তিনি করেননি’ (বুখারী, মুসলিম)
উছদের দিনে, উবাই বিন খালাফ, যোড়ায় চড়ে, রাসূল সা) এর দিকে আক্রমণ
করতে আসল, হাতে বর্শা নিয়ে। কিছু মুসলিম উঠে দাঁড়াতে চাইলেন তাকে
প্রতিরোধ করার জন্য, কিন্তু রা সা) সবাইকে বারণ করলেন, বললেন, সরে যাও।
রাসূল সা) একটি বর্শা উঠিয়ে নিলেন, এবং সেটা উবাই এর দিকে ছুঁড়ে মারলেন,
যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত লোহার বর্মে ঢাকা ছিল। তার চোখ এবং ঘাড়ের দিকের
একটি ছোট অংশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আর ঘাড়ের ঠিক সেখানেই
বর্শাটি আঘাত করে গেল এবং সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। যদিও বর্ম পড়ে থাকার

কারণে খুব সামান্য একটা আঁচড়ের বেশি আঘাত লাগেনি, কিন্তু সে যাঁড়ের মত চোঁচাতে লাগল এবং বলতে লাগল, ‘মুহাম্মাদ আমাকে মেরে ফেলল!’ কুরাইশের লোকেরা তাকে পরীক্ষা করে দেখল, এবং বলল, ‘আমরা কোন বড় আঘাত দেখতে পেলাম না। তুমি ঠিক হয়ে যাবে! সে বলল, ‘মুহাম্মাদ বলেছিল, সে আমাকে হত্যা করবে, কাজেই এটা সত্যি হবেই’, পরে সে ফিরতি পথে মক্কার পথে মারা যায়।

এই উম্মাহর সাহসী ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক, এই লিস্টের উপরের দিকে যারা আছেন, তারা হলেন সাহাবা, যাদের প্রশংসা আল্লাহ কুর’আনে করেছেন :

“আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল”। সূরা ফাতাহ ২৯

এই উম্মতের বিখ্যাত সাহসী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আছেনঃ

১ আবু বকর (রা.)

আবু বকরের সাহসিকতার সাক্ষী এই উম্মতের আরেক বীর, আলি ইবন আবী তালিবা। যখন আলী খলিফা হলেন, তাকে প্রশ্ন করা হল, “মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী কে?”

তারা বলল, ‘আপনি’

তিনি বললেন, ‘আমি কখনো কারও সাথে দৈতযুদ্ধে হারিনি। কিন্তু লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী হলেন আবু বকর। বদরের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ সা) এর জন্য একটি ছাউনি নির্মাণ করেছিলাম এবং আমাদের প্রশ্ন করা হল, কে হবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহরক্ষী? আবু বকর তাঁর তরবারী খাপ মুক্ত করে সেখানে এলেন, এবং সারাদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করলেন। মক্কাতে একবার, কুফফাররা রাসূল সা) কে আক্রমণ করেছিল, যেই কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, তাকেই অন্যেরা আটক করছিল এবং মারধর করছিল, আর বলছিল, ‘তোমরা কি সব দেব দেবীর পরিবর্তে একজন দেবতা স্থির করেছ?’ কেউই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাওয়ার সাহস করছিলেন না, একমাত্র আবু বকর ব্যতিক্রম। তিনি গেলেন, এবং তাদের সাথে লড়াই বাঁধিয়ে দিলেন, এবং বলছিলেন, ‘তোমরা কি একজন

লোককে শুধুমাত্র এই কারণে হত্যা করতে যাচ্ছ যে সে বলে, ‘আল্লাহ আমার রব!’

এরপর আলী প্রশ্ন করলেন, ‘কে উত্তম, আবু বকর না ফেরাউনের সভাসদের সেই ব্যক্তিটি?’ (ফিরাউনের সভাসদদের মধ্যেও এক ব্যক্তি অনুরূপ মন্তব্য করেছিল যখন ফিরাউন সিদ্ধান্ত নিল মূসাকে হত্যা করবে)

লোকেরা নীরবতা অবলম্বন করলো। তিনি বললেন, ‘তোমরা উত্তর করছ না কেন?’

আল্লাহর নামে, আবু বকরের জীবনের একটি মুহূর্ত উত্তম, সারা দুনিয়া যদি ভর্তি হয়ে যায় সেই ফিরাউনের সভার ঈমানদার ব্যক্তিদের মত ব্যক্তি দিয়ে। ফিরাউনের সভাসদের সেই ব্যক্তিটি নিজের ঈমানকে গোপন রেখেছিল, আর আবু বকর তাঁর ঈমানকে প্রকাশ করেছিলেন’।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর এই উম্মতের সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তি হলেন আবু বকর। বদরের যুদ্ধের ঘটনা থেকে, উহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া, হুনাইন ইত্যাদি থেকে একজন ব্যক্তির উচিত তার অন্তরের দৃঢ়তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা। সব বিপর্যয়ের বড় বিপর্যয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন সেটাই যথেষ্ট তার অবিচলতা, দৃঢ়তা, এবং মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা সম্পর্কে জানান দেয় জন্য। সেটা ছিল এমন এক মুহূর্ত যখন অন্তর বিচলিত ছিল, উম্মাহ বিপর্যস্ত ছিল। যখন সবার অন্তর কাঁপছিল, সিদ্দিকের অন্তর সুদৃঢ় ছিল। যদি দাড়িপাল্লার একদিকে আবু বকরের অন্তর আর বিপরীত দিকে সমস্ত উম্মাহর অন্তর স্থাপন করা হয়, তাহলে আবু বকরের অন্তরই ভারী হবে। মুরতাদদের সাথে আবু বকরের যুদ্ধ ঘোষণার সাহসী সিদ্ধান্ত, এই সাহসিকতাকে যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত কাপুরুষদের অন্তরে বন্টন করে দেয়া যায়, সেটা তাদেরকে সাহসী করে তুলবে।

২/ খাতাবের পুত্র উমর (রা.)

এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে যে, উমরের ভয়ে ভীত হয়ে শয়তান সেই পথ পরিহার করে চলত। আল্লাহর রাসূল সা) উমরকে বলেছিলেন, ‘হে খাতাবের পুত্র, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, শয়তান তোমাকে এক রাস্তায় দেখলে সে অন্য

রাস্তা ধরে’। (বুখারী) তার ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি পেল। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, ‘উমর মুসলিম হবার আগ পর্যন্ত আমরা প্রকাশ্যভাবে কাবার কাছে সালাত আদায় করতে পারতাম না’।

৩/ আলি বিন আবি তালিব(রা.)

তিনি ছিলেন এই উম্মাহর একজন সিংহপুরুষ। তিনি একমাত্র তাবুক যুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেননি, কারণ সেই সময়ে রাসূল সা) তাঁর অনুপস্থিতিতে তাকে মদীনার দায়িত্বে নিয়োজিত রাখেন। খায়বারের যুদ্ধের সময় রাসূল সা বলেন, ‘আগামীকাল আমি যুদ্ধের ব্যানার এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দিব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। তিনি যুদ্ধের ময়দানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না, এবং আল্লাহ তাঁর হাতেই আমাদের বিজয় দান করবেন’। সব সাহাবাই সেই সম্মান মনে মনে চেয়েছিলেন। পরের দিন, রাসূল সা) আলীকে ডাকলেন এবং তাকে যুদ্ধের ব্যানার তুলে দিলেন। মুস’আব আল যুবাইরি বলেন, ‘আলি যুদ্ধের ময়দানে খুব সতর্ক থাকতেন। তিনি তার শত্রুর প্রতি ক্ষিপ্ত গতিতে ঘুরতেন আর যখন তিনি তাঁর শত্রুর দিকে হামলা করতেন, তিনি নিজের চতুর্দিক থেকে নিজেকে রক্ষা করতেন, আর যখন ফিরে আসতেন তখন তিনি নিজেকে আরও সতর্কতার সাথে রক্ষা করতেন। কেউ তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস করতো না, তার ঢাল একমুখী থাকত। এটা শুধুমাত্র সামনের দিক থেকে তাকে রক্ষা করতে পারতো। যখন তাকে প্রশ্ন করা হল, ‘আপনি কি এই ভয় করেন না যে, আপনার পিছন দিক থেকে হামলা হতে পারে?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘আমি আমার শত্রুকে কখনো এই সুযোগই দেই না যে, সে আমার পিছন থেকে এসে হামলা করতে পারবে’।

৪/ তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.)

তিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন। তিনি উহুদের যুদ্ধে নিজের দেহকে ঢাল বানিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করেছিলেন এবং ৭০ টির বেশি আঘাত পেয়েছিলেন। এমনকি যখনই রাসূলুল্লাহ সা) কুফফারদের দিকে তাকাতে চাইতেন তালহা তাকে অনুরোধ করতেন বিরত থাকার জন্য এবং নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করে রাখতেন।

৫/ আল যুবাইর আল আওয়াম (রা.)

তিনিও জালাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন। তিনিই প্রথম মুসলিম যিনি তরবারী খাপমুক্ত করেছিলেন। মক্কার ইসলামের প্রাথমিক যুগে একটি গুজব রটানো হল যে, আল্লাহর রাসূলকে অপহরণ করা হয়েছে। আল যুবাইর তার তরবারী কোষমুক্ত করলেন এবং তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি রাসূলুল্লাহর দিকে দৌড়ে গেলে, রাসূল সা) তাকে প্রশ্ন করেন, “যুবাইর, কোন সমস্যা?”

তিনি বলেন, “আমি শুনেছিলাম, আপনাকে অপহরণ করা হয়েছে, তাই আমি তাদের সাথে লড়াই করতে এসেছিলাম।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দুয়া করেন।

৬/ সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.)

তিনি জালাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দুয়া করেছিলেন, ‘হে আল্লাহ! তার তীরগুলোকে লক্ষ্যভেদ করিয়ে দাও, তার দুয়া কবুল করে নাও’। উমর তাকে কাদিসিয়াহ’র যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। মুসলিমরা বিজয়ী হয়েছিল, এবং তিনি তাদেরকে পারস্যে নেতৃত্ব দিতে থাকেন যতক্ষণ না তিনি অধিকাংশ এলাকা বিজয় লাভ করেন এবং রাজধানীতে প্রবেশ করেন, আল মাদায়েন। সাদ, তিনি কুফা এবং বাসরা নগরী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় তিনি ওসীয়ত করেছিলেন যেন তার দেহকে একটি পুরনো উলের কাপড়ে কাফন দেয়া হয়। তিনি বলেন, এটা পরেই আমি বদরের যুদ্ধ করেছিলাম এবং এই দিনের জন্য তা সংরক্ষণ করে রেখেছি।

৭/ আবু উবাইদাহ বিন আল যাররাহ (রা.)

তিনিও জালাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। উমার তাকে শাম বিজয়ী বাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনিই ছিলেন ইয়ারমুকের সেই বিখ্যাত যুদ্ধের সেনাপতি। তিনি শামে যখন প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ে সেই রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

৮/ হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব (রা.)

তিনি আসাদুল্লাহ- আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের সিংহ। যখন বদর যুদ্ধের পর উমাইয়া বিন খালাফ যে বন্দী হয়েছিল সে আব্দুর রহমান বিন আউফকে প্রশ্ন করল, ‘তোমাদের মধ্যে ঐ লোকটি কে ছিল যার বুকে উট পাখির পালক লাগানো ছিল?’

আব্দুর রহমান বলেন, ‘তিনি ছিলেন হামযাহ’। উমাইয়া বললো, ‘সেই আজকে আমাদের সর্বনাশ করে ছেড়েছে’। তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।

৯/ জাফর বিন আবু তালিব (রা.)

তিনি তাঁর ভাই আলির থেকে বছর দশেকের বড়। নু’তার যুদ্ধে তিনি পর্যায়ক্রমে ২য় ব্যক্তি হিসেবে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যখন যারিদের পর দায়িত্ব বুঝে পান, তিনি ডানহাতে যুদ্ধের ব্যানার বহন করছিলেন, এরপর যখন ডান হাতটা কাটা গেল তিনি বাম হাতে সেই পতাকা তুলে ধরেন, আর বাম হাত কাটা পড়লে তিনি দুই বাহু দিয়ে পতাকাকে আঁকড়ে ধরে রাখেন, যতক্ষণ না তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এরপর লোকেরা তাঁর দেহে ৯০টিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন খুঁজে পায়।

১০/ মুয়ায বিন আমর বিন আল যামুহ(রা.)

তিনি ছিলেন এই উম্মাহর ফেরাউন আবু জাহেলের জবাইকারী। তিনি বলেন, আমি বদর যুদ্ধের দিন আবু জাহেলকে আমার টার্গেট স্থির করে নেই। যখন আমি তাকে পাই, আমি তাকে আক্রমণ করি, এবং আমার তরবারী দিয়ে হামলা করি আর তার পা দ্বিখন্ডিত করে দেই। এরপর তার সন্তান ইকরিমাহ আমার ঘাড়ে আঘাত হানে এভাবে আমার বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শুধু একটি চামড়ার উপর সেই কাটা বাহু ঝুলে থাকে। কিন্তু, এতে আমার যুদ্ধ করতে অসুবিধা হচ্ছিল, দিনের অধিকাংশ সময় সেটা আমার পিছনে ঝুলতে থাকে। কিন্তু, বেশি অসুবিধা দেখে দিলে, আমি পা দিয়ে চেপে ধরে আমার সেই বাহুকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি।

১১/ আল বারাহ বিন মালিক (রা.)

তিনি আনাস বিন মালিকের ভাই, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম ছিলেন। তিনিই এই উম্মাহর বীর পুরুষদের একজন। আনাস একদিন দেখলেন তাঁর ভাই বারাহ কি যেন কবিতা গুনগুন করছেন, তাই তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘ও আমার ভাই, কবিতা পড়ছো নাকি? কেমন হয় যদি এটাই তোমার

শেষ কথা হয়ে যায়? ’ [যখন কুর’আন নাযিল হচ্ছিল, তখন সাহাবারা কুর’আন বাদে অন্য কিছু তিলাওয়াত কিংবা আবৃত্তি করাটা অপছন্দ করতেন। এ কারণেই আনাস তাঁর ভাইকে সতর্ক করে বলছিলেন, ভাই এই কবিতা আবৃত্তি করা অবস্থায় যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে কিভাবে তুমি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে? আরেকটি বর্ণনায় তিনি বলছিলেন যে আল্লাহকে স্মরণ করো] আল বারাহ বলেন, ‘না ! আমার মত লোক বিছানায় মরতে পারে না, আমি ৯৯জন কাফির মুনাফিককে হত্যা করেছি’। (মুসান্নাফ ইবন বিন শাহ্বা)

উমর তাঁর মিলিটারি জেনারেলদের কাছে লিখে পাঠালেন যে বারাহ বিন মালিককে কখনো নেতৃত্বের কোন পদ দিও না, কারণ সে মুসলিমদের মধ্যে একটু বেশি বেপরোয়া (অর্থাৎ এত আক্রমণাত্মক যে সাধারণ মুসলিমদের বিপদ হতে পারে !)

(আল হাকিম)

একটি উদাহরণ, মুসায়লামা মিথ্যুক নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি অবরুদ্ধ ফটক খোলার জন্য অপর মুসলিমদের বললেন, তোমরা আমাকে একটি ঢালের উপর বসিয়ে দাও, এরপর বর্ষার মাথার ঢাল বহন করে দেয়ালের উপর দিয়ে ঢাল সহ আমাকে ছুঁড়ে মার ! এরপর তাকে ছুঁড়ে মারা হল, তিনি সেই দূর্গের ফটক খুললেন ঠিক, কিন্তু এরপর তার দেহে ৮০টিরও বেশি জখম হল। (আল ইসাবাহ)

তাস্তরের যুদ্ধে, আল বারাহকে বললেন, আপনি বাইয়াত গ্রহণ করুন বিজয় পর্যন্ত আল বারাহ বলেন, ‘ইয়া আল্লাহ ! আমি এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করছি যে, আপনি আমাদেরকে তাদের কাঁধের উপর স্থাপন করুন, (আমাদের বিজয় দান করুন) এবং আমাকে আপনার নবীর পথে নিয়ে নিন (মৃত্যু)। তিনি শত্রুদের আক্রমণ করলেন, এবং মুসলিমরা তাকে অনুসরণ করল, পারস্যবাসীরা পরাজিত হল। এবং আল বারাহ শহীদ হলেন। আল্লাহ তাঁর বাইয়াতকে তাঁর শপথকে পূর্ণ করে দিলেন।

আনাস বলেন, যখন আবু মূসাকে আল বাসরার গভর্নর পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল তিনি আল বারাহকে বলেন যেকোন নেতৃত্বের পদ নির্বাচন করে নিতে, এবং তার সরকারের সেই পদেই তাকে নিযুক্ত করা হবে। আল বারাহ বলেন, ‘আমি এসব কিছু চাই না। বরং আমি চাই, আমাকে আমার ঘোড়া, বর্শা, ঢাল, তরবারী এগুলো

দিয়ে দিবেন এবং আমাকে জিহাদে প্রেরণ করবেন। সেই বাহিনীর প্রথম নিহত ব্যক্তি হলেন আল বারাহ ’ (ইমাম আবু শাইবাহ)

১২/ আবু দুজানা (সান্নাক বিন খারশাহ) (রা.)

উহুদ যুদ্ধের পূর্বে রাসূল সান্নাক্স আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম একটি তরবারী বের করলেন এবং বললেন, ‘কে আছ এই তরবারী দিয়ে লড়াই করবে এবং একে প্রাপ্য হক দিবে?’

কিছু লোক উঠে দাঁড়াল এবং এটা চাইল, কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাদের কাউকেই দিলেন না। এরপর আবু দুজানা উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ ! এর হক কি ?’ তিনি বলেন, ‘আর তা হল তুমি এটা দিয়ে শত্রুদের মুখে আঘাত করবে যতক্ষণ না তা বাঁকা হয়ে যায়’।

আবু দুজানা বলেন, ‘আমি এটা গ্রহন করব ইয়া রাসুলুল্লাহ’। এবং তিনি তাকে সোটা দিলেন। আল যুবাইর বিন আল আওয়াম বলেন, ‘আমি কিছুটা মন খারাপ করেছিলাম, আমি আল্লাহর রাসূল সান্নাক্স আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের ফুপাতো ভাই। আমি চাইলাম, আর তরবারীখানা পেলাম না, কিন্তু আবু দুজানা পেয়ে গেল। কাজেই আমি আবু দুজনাকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং সে কি করে তা দেখার জন্য। আবু দুজানা একটি লাল পট্টা নিয়ে মাথায় বাঁধলেন, আনসাররা বলেন, ‘আবু দুজানা তার মৃত্যুর রুমাল বেঁধে নিয়েছে! এরপর তিনি শত্রুদের আক্রমণ করলেন এবং যাকে সামনে পেলেন তাকেই হত্যা করলেন’।

এবং যুদ্ধের পূর্বে তিনি শত্রুসারির সামনে গর্বের সাথে হাটলেন। আল্লাহর রাসূল সান্নাক্স আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘এটা এমন হাটা যা আল্লাহ ঘৃণা করেন, কিন্তু এই অবস্থা ব্যতিক্রম’।

ইয়ামামার যুদ্ধে, তিনি নিজেকে একটি দেয়ালের উপর দিয়ে ছুঁড়ে দেন যা শহরকে ঘিরে রেখেছিল এবং পড়ে গিয়ে নিজের পা ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি সেই ভাংগা পা নিয়েই যুদ্ধ চালিয়ে যান যতক্ষণ না শাহাদাত বরণ করেন।

১৩/ খালিদ বিন আল ওয়ালিদ (রা.)

তিনি আল্লাহর নির্বাচিত তলোয়ার। যখনই তিনি মুসলিম হলেন, রাসুলুল্লাহ সা) তাকে শত্রুদের সাথে লড়াই এর কাজে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি জীবনে কোন যুদ্ধে

পরাজিত হননি। খালিদ বিন আল ওয়ালিদ বলেন, ‘যদি আমার একজন সুন্দরী নারী যাকে আমি ভালোবাসি তাকে বিয়ে করার অবস্থা সামনে থাকে, অথবা যদি আমাকে এই সুসংবাদ প্রদান করা হয় যে, তোমার একজন পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেছে, এটাই আমার নিকট কম প্রিয় হবে এবং আমার অন্তরে কম পছন্দের হবে, বরং এক বরফের ন্যায় শীতল রাত্রিতে যদি আমাকে বলা হয়, একটি বাহিনী তোমার শত্রু হিসেবে আগামীকাল সকালে তোমার অপেক্ষায় আছে আমি সেটাই বেশি পছন্দ করব। আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, জিহাদে যাও !’ এই কথাগুলো ছিল খালিদের মৃত্যুশয্যায় বলা।

১৪/ সালামাহ বিন আল আকওয়া (রা.)

আমরা তাঁর ঘটনা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি, যেখানে তিনি একাই কুফফারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেন, “আমাদের পদাতিকদের মধ্যে আজকের দিনের সেরা সালামাহ বিন আল আকওয়া’।

১৫/ উকবাহ বিন মাহসিন (রা.)

যুদ্ধের ময়দানে তাঁর বীরত্ব সবার কাছেই সুপরিচিত। গাবাহ’র যুদ্ধে তিনি দেখলেন আমার বিন আবার তার পিতার সাথে একই উটের উপর বসে আছে, তিনি সেদিকে লক্ষ্য করে তাঁর বর্শা ছুঁড়ে মারলেন এবং একই আঘাত একই বর্শায় দুজনকে নিহত করে দিলেন।

১৬/ আমর বিন মা’আদি ইয়াকরিব. (রা.)

তিনি ইয়েমেনের একজন রাজা ছিলেন, যিনি তাঁর সাহসীকতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে মুসলিম হলেন। উমার তাকে এক হাজার লোকের সমান মনে করতেন। আল তারতুসী তার সিরাজ আল মালুক কিতাবে বলেন, আমার বিন মায়াদি ইয়াকরিব নদীর তীরে গেলেন এবং লোকদের বললেন, ‘আমি সেতু পার হতে যাচ্ছি। যদি তোমরা এতটুকু সময় পরে আমাকে অনুসরণ কর যতটুকু সময় একটা উট জবাই করতে লাগে, তাহলে তোমরা আমাকে পাবে আমার তরবারী সহ লড়াইরত অবস্থায়, আমার সামনে যেই আসুক না কেন, আমার চারপাশে শত্রু ঘিরে থাকা অবস্থায়, আর আমি তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকব। আর এর পরে যদি

তোমরা আস, তাহলে আমাকে মৃত অবস্থায় পাবে’। এবং এরপর তিনি সেতু পার হলেন এবং শত্রুদের শিবিরে পৌঁছে গেলেন, এরপর তাঁর লোকেরা চিৎকার দিয়ে উঠলো, ‘হে জাবিদের বেটারা ! আমরা কি আমাদের লোকটাকে একলা তাদের মাঝে ছেড়ে দিব? দেরি করলে আমরা তাকে জীবিত অবস্থায় আর পাব না’ কাজেই এরপর তারা সেতু পার হল এবং সেখানে গিয়ে দেখল সে ঘোড়াবিহীন অবস্থায় লড়ছে আর শত্রুদের একটি ঘোড়ার পিছনের দুইটি পা এমনভাবে ধরে আছে যে সেই ঘোড়াটি নড়তে পারছে না ! ঘোড়ার উপরে বসে থাকা ঘোদ্ধাটি আমার কাছের আসার চেষ্টা করছিল কিন্তু সে নাগাল পাচ্ছিল না, তার তরবারী কোন কাজে আসছিল না। যখন ঘোদ্ধাটি দেখল আমরা সবাই তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছি, তখন সে ঘোড়া থেকে নেমে পালিয়ে গেল। তখন আমার সেই ঘোড়ার উপরে চড়ে বসলেন। এরপর তিনি আমাদের বললেন, ‘তোমরা আর একটু পরে এলেই আমাকে আর পেতেনা’। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার ঘোড়াটি কই’? তিনি বলেন, ‘একটা তীর এসে ওটাকে মেরে ফেলে আর আমি ওর পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম’।

১৭/ ইকরামা, আবু জাহেলের পুত্র(রা.)

তিনি ইসলাম পূর্ব জীবন থেকেই দুঃসাহসী ছিলেন, এবং ইসলাম গ্রহণের পর তা কেবল বৃদ্ধিই পেল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি দুর্ধর্ষ লড়াই করেন। তাকে বলা হল, ধীরে, সাবধানে ! তিনি জবাব দিলেন, ‘আমি লাত আর উয্যাকে (দুইটি মূর্তি) রক্ষার জন্যে এক সময় লড়াই করেছি, আর তখনো আমি নিজের জন্যে কোন খেয়াল করতাম না। আর আজকে যখন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যে লড়াই করছি, আমাকে বলছো সাবধান হতে!’ এরপর তিনি বলেন, ‘কে আছো, মৃত্যুর উপর বাইয়াত দিবে?’

আল হারিথ বিন হিশাম, দিহার বিন আল আযওয়ার এবং আরও ৪০০ জন দুঃসাহসী মুসলিম বের হলেন এবং বাইয়াত করলেন। তারা রোমানদের উপর আক্রমণ করলেন, এবং তাদের র্যাংককে অদৃশ্য করে দিলেন। ইকরিমাহ আর ফিরে আসেননি, তাঁর দেহ যখন খুঁজে পাওয়া গেল, তার মধ্যে সত্তরটিরও বেশি জখম দেখা গেল।

১৮/- তুলাইহা আল আযদি- (রা.)

যখন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস পারস্য অভিযানে ছিলেন তখন তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে খলিফা উমরের কাছে রি ইনফোর্সমেন্ট এর আবেদন পাঠালেন, উমর জবাব দিলেন, ‘আমি তোমার কাছে দুই হাজার পুরুষ পাঠালাম, আমার বিন মা’দি ইয়াকরিব এবং তুলাইহা আল আযদি। তাদের প্রত্যেকে এক হাজার জনের সমান’। তুলাইহা, আমার এবং কয়েস বিন মাকসুহ তিনজনের দলটিকে একটি তদন্ত করতে স্কাউট হিসেবে পাঠানো হল, শত্রুদের বাহিনীর কাছে। আমার এবং কয়েস দুইজনে মিলে কয়েকজন পারস্য সেনাকে অপহরণ করলেন, এবং তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুসলিম ক্যাম্পে নিয়ে আসলেন। তুলাইহা আরও বড় কাজ করে দেখালেন, তিনি শত্রু সেনাদের ঘাঁটিতে প্রবেশ করলেন এবং অগ্নসর হতে লাগলেন এভাবে যতক্ষণ না সরাসরি কমাণ্ডারের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন !

তিনি রাত ঘনিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, এরপর সরাসরি তিনি কমাণ্ডারের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন, এবং তার ঘোড়া ছিনিয়ে নিলেন, যা তাঁবুর সাথে বাঁধা ছিল এবং এরপর সেখান থেকে চলে এলেন। কিন্তু একজন পারসী সেনা তাকে দেখে ফেললেন এবং ধাওয়া করলেন। তুলাইহা তাকে হত্যা করলেন, এবং কমাণ্ডারের ঘোড়ার সাথে তার ঘোড়াটিকেও নিয়ে আসতে লাগলেন, আরেকটি ঘোড়সওয়ার তাকে দেখে ফেলে এবং ধাওয়া করলো, তুলাইহা তাকেও হত্যা করে তার ঘোড়াটিকেও ছিনিয়ে নেন, এরপর তৃতীয় আরেকজন ঘোড়সওয়ার তাকে ধাওয়া করে এবং তুলাইহার কাছে সে ভয়ে আত্মসমর্পণ করে। তুলাইহা ঘোড়াগুলোর সাথে তাকেও আটক করে নিয়ে আসতে থাকেন, অর্থাৎ একজন বন্দী ও চারটি ঘোড়া নিয়ে তিনি মুসলিম শিবিরে চলে আসেন, মুসলিম নেতাগণ সেই পারসী সেনার দিকে মনোযোগ দিলেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, দেখলেন সেনাটি তাদের একজন নেতা !

সেই পারসী সেনা পরবর্তীতে মুসলিম হন এবং আসুন তাঁর জবানীতেই সেই লোমহর্ষক ঘটনাটি শুনি, তিনি বলেন,

‘ আমি অসংখ্য যুদ্ধ লড়েছি, কিন্তু এই ব্যক্তিটির মত দ্বিতীয়টি দেখিনি ! তিনি শুধু আমাদের সীমানাতেই প্রবেশ করেননি, এমন এক স্থানে প্রবেশ করেছেন, যেখানে বীর সাহসী ব্যক্তির পর্যন্ত সাহস করে না, আমাদের সেনাদের কমাণ্ডারের তাঁবুতে ! সেখানে ৭০,০০০ সৈন্য ছিল। যেন তাঁর জন্যে এটাও যথেষ্ট হল না, তিনি

আরও সামনে এগিয়ে গেলেন, এমনকি কমাণ্ডারের ঘোড়াটিকেই ছিনিয়ে নিলেন, আর আমাদের প্রথম যে ব্যক্তি তাকে ধাওয়া করেছিল তাকে আমরা ১০০০ জনের সমকক্ষ বলে মনে করতাম, আর তিনি কিনা তাকে কতল করে দিলেন। দ্বিতীয় একজন তাকে ধাওয়া করলো, আর তিনি তাকেও শেষ করে দিলেন, এবং এরপর আমি ধাওয়া দিলাম, আর আমি মনে করিনা বাহিনীতে আমার মত শক্তিশালী এবং সাহসী আর কেউ আছে, কিন্তু আমি তাঁর হাতে মৃত্যু দেখতে পেলাম, আত্মসমর্পণ করলাম।' সেই পারসী সেনানায়ক পরবর্তীতে মুসলিম হন এবং মুসলিমদের সাথে জিহাদ করেন।

১৯/ আব্দুল্লাহ বিন আল যুবাইর (রা.)

তিনি ছিলেন বীরের পুত্র বীর। তাঁর পিতা ছিলেন আল যুবাইর বিন আল আওয়াম। আবদুল্লাহ উত্তর আফ্রিকা বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং জানজিরকে হত্যা করেছিলেন, যিনি ছিলেন বারবার এর রাজা।

২০ আব্দুল্লাহ বিন আবি আল সারহ-(রা.)

তিনি আফ্রিকার অন্যতম বিজেতা। তিনি মুসলিমদের প্রথম নৌবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। রোমানদের বিরুদ্ধে আল সাযারি এর যুদ্ধ, তিনি উসমান রা) এর সময়ে মিশরের গভর্ণর পদে নিযুক্ত ছিলেন। যখন ফিতনা শুরু হল তখন তিনি অবসর নিয়ে রামাল্লা ফিলিস্তিনে চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করেন।

২১/ আমরের পুত্র আল কা'কা (রা.)

বদর যুদ্ধের পূর্বে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করছিলেন, তখন আল কা'কা বলে উঠেন, 'সামনে এগিয়ে যান এবং লড়াই করুন, আর আমরাও বনী ইসরাইলের লোকেরা মূসাকে যা বলেছিল সেটা বলব না, 'আপনি এবং আপনার রব গিয়ে লড়াই করুন, আমরা এখানে বসে রইলাম' বরং আমরা বলব, 'আপনি সামনে এগিয়ে যান এবং আপনার রবকে সাথে নিয়ে লড়াই করুন, আমরাও সমানতালে আপনার সাথে লড়াই করব'।

আবু বকর তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'যুদ্ধের ময়দানে আল কা'কার কণ্ঠের আওয়াজ এক হাজার লোকের থেকেও উত্তম'।

মূলঃ শাইখ ইবন নুহাস(মৃত্যু ৮১৪ হিজরী) এর মাশারী আল আশউয়াক ইলা
মাশারী আল-উশাক ,

অধ্যায় ১৫

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৫১৩>

নিফাক মুমিন থেকে ঈমান বের করে দেয়

mdkhaled

Junior Member

০৫-১৭-২০১৭

মুমিন একজন পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে শিরক, ফিসক, নিফাক, মিথ্যা, হিংসা, লোভ, রাগ ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটে না, বিশেষ করে ঈমানদারের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হলো নিফাক তথা দ্বিমুখী আচরণ করা।

নিফাক মুমিন থেকে ঈমান বের করে দেয়। মুমিনদের মধ্যে এ নিফাক থাকা অনুচিত। কেননা এ বৈশিষ্ট্যের কারণে তার সব সদগুণ বদগুণে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

মুনাফিকের সংজ্ঞা : মুনাফিক শব্দটি নফক শব্দ থেকে গঠিত। নফকের অর্থ—গর্ত, ছিদ্র, সুড়ঙ্গ, বের হওয়া, খরচ করা, ব্যয় করা। কারো মতে, ‘নাফেকুল ইয়ারবু’ (পাহাড়ি ইঁদুর) থেকে মুনাফিক শব্দটি গঠিত। পাহাড়ি ইঁদুরকে ‘নাফেকুল ইয়ারবু’ বলা হয়। কারণ পাহাড়ি ইঁদুর অত্যন্ত ধূর্ত হয়, এরা পাহাড়ে অনেক গর্ত খনন করে। এদের মারার জন্য এক গর্তে পানি বা অন্য কিছু দিলে অন্য গর্ত দিয়ে বের হয়ে পালিয়ে যায়, ফলে এদের সহজে মারা যায় না। মুনাফিকও অনুরূপ ধূর্ত। তাদের সহজে চেনা যায় না। মুনাফিকের সংজ্ঞায় সাইয়েদ মুফতি আমিনুল ইহসান বলেছেন, মুনাফিক হলো এমন ব্যক্তি যে ইসলামকে মুখে প্রকাশ করে এবং অন্তরে কুফরিকে লালন করে।

মুনাফিকের চরিত্র : আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার ৮ থেকে ২০ পর্যন্ত মোট ১৩টি আয়াত মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে নাজিল করেছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন সূরায় আরো ৩৮টি আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা করেছেন। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো—

দুমুখো স্বভাবের : তারা দুমুখো আচরণ করে। বাহ্যিকভাবে নিজেদের মুমিন বলে পরিচয় দেয় অথচ তাদের ভেতরে ঈমান নেই। ঈমান তিনটি জিনিসের সমন্বয়ের নাম। ১. অন্তরের বিশ্বাস, ২. মৌখিক স্বীকৃতি এবং ৩. স্বীকৃতি অনুযায়ী আমল করা (ইবনে মাজাহ)। মুনাফিক শুধু মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকৃতি দান করে,

কিন্তু অন্তরে মোটেও বিশ্বাস লালন করে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আর মানুষের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা বলে আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনেছি, অথচ তারা মুমিন নয়।’ (সূরা বাকারা, আয়াত : ৮)

প্রতারক ও ধোঁকাবাজ : তারা খুবই ধূর্ত প্রতারক ও ধোঁকাবাজ। আল্লাহ ও মুমিনদের সঙ্গে তারা প্রতারণা করে। তারা মনে করছে, এতে তারা সফলকাম ও বিজয়ী হচ্ছে, অথচ প্রকারান্তরে তারাই প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হচ্ছে। সত্য পথ থেকে দূরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হচ্ছে এবং তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আল্লাহ ও ঈমানদারদের তারা ধোঁকা দিতে চায়, আসলে তারা অন্য কাউকে ধোঁকা দিচ্ছে না, বরং নিজেদেরই প্রতারিত করছে, অথচ তাদের সে অনুভূতি নেই।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ৯)

তাদের অন্তর অসুস্থ : সুস্থতার সীমা থেকে বের হয়ে গেলেই অসুস্থতা বলা হয়। মুনাফিকদের আকিদা-বিশ্বাসে সন্দেহ, অস্বীকৃতি ও মিথ্যা থাকার কারণে তাদের কলবকে অসুস্থ কলব বলা হয়। অসুস্থতা হলো সুস্থতার বিপরীত। দ্বিমুখী আচরণ একটি কঠিন ব্যাধি। আর খাঁটি বিশ্বাস হলো সুস্থতা। ঈমান আনার পর যারা দ্বিমুখী আচরণ করে, তারা মূলত অসুস্থ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘তাদের হৃদয়ে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ সে ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের মিথ্যাচারের দরুন তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।’ (সূরা : আল বাকারা, আয়াত : ১০)

নিজেদের শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী মনে করে : মুনাফিকরা সমাজে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে, অথচ তারা প্রচার-প্রপাগান্ডায় নিজেদের শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী বলে পরিচয় দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আর যখনই তাদের বলা হয়, পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি কোরো না, তারা উত্তরে বলে—আমরাই তো সংশোধনকারী ও শান্তিকামী।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১১)

ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী : ইসলাম শান্তির ধর্ম। মুনাফিকরা ইসলাম ও সামাজিক শান্তির বিরোধিতা করে অশান্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে অনুভব করতে পারছে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘সাবধান! এরাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাদের সে অনুভূতি নেই।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১২)

মুমিনদের নির্বোধ মনে করে : মুনাফিকরা নিজেদের বুদ্ধিমান, ধূর্ত, চতুর ও চালাক মনে করে। আর মুমিন, মুত্তাকি ও নেককারদের নির্বোধ ও বোকা বলে মনে করে। অথচ আল্লাহ তাআলার কাছে তারাই বোকা ও নির্বোধ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘যখন তাদের বলা হয়, অন্য লোকদের ন্যায় তোমরাও ঈমান আনো, তখন তারা বলে, আমরা কি সেই নির্বোধ লোকদের মতো ঈমান আনব? আসলে তারাই তো নির্বোধ, কিন্তু তাদের সে জ্ঞান নেই।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৩)

উপহাসকারী : মুনাফিকরা মুমিন ও কাফির সবার সঙ্গে মেশে। মুমিনদের সঙ্গে মিশে মুমিনদের পক্ষের লোক বলে দাবি করে। আবার কাফিরদের সঙ্গে মিশে বলে আমরা তোমাদেরই লোক। মূলত কারো সঙ্গে তাদের আন্তরিক ও গভীর ভালোবাসা নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘যখন তারা মুমিনদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আবার যখন নিরিবিলা তাদের শয়তানদের (কাফির নেতাদের সঙ্গে) মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তাদের (মুমিনদের) সঙ্গে শুধু ঠাট্টা-তামাশা করছি মাত্র।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৪)

অবাধ্যতার বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায় : মুনাফিকদের তাদের ভ্রষ্টতার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি না দেওয়ায় এবং দুর্নীতিপরায়ণ হয়েও পার্থিব জগতে সুখ-শান্তিতে কালাতিপাত করার সুযোগদানের ফলে তাদের ভ্রষ্টতা আরো গভীরে অনুপ্রবেশ করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘বস্তত আল্লাহই তাদের সঙ্গে তামাশা করছেন (তাদের তামাশার জবাব দিচ্ছেন) এবং তাদের তাদের অবাধ্যতার বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দিচ্ছেন।’ (সূরা বাকারা-১৬) রাসুলুল্লাহ (সা.)

বলেন, ‘যখন তোমরা কোনো বান্দাকে দেখতে পাও যে সে পাপী হওয়া সত্ত্বেও তার পছন্দনীয় জিনিস তাকে দেওয়া হচ্ছে এবং সে সুখ-শান্তিতে আছে, তবে মনে করবে তা তার জন্য পাকড়াও করার অবকাশ মাত্র।’ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আমি শাস্তি না দিয়ে সুযোগ দিই পাপ বৃদ্ধির জন্য।’ (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৭৮)

ভ্রষ্টতা ক্রয় করে : মুনাফিকরা দুনিয়ার লালসায় হেদায়েতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করে। তারা হেদায়েতের ওপর ভ্রষ্টতাকে অগ্রাধিকার দেয়। মানুষ যে

জিনিসকে ভালোবাসে ও পছন্দ করে, সে জিনিসই ক্রয় করে। মুনাফিকরা ঈমান বিক্রি করে নিফাককে ক্রয় করে—অর্থাৎ ঈমানের ওপর নিফাককে প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘তারা এমন লোক, যারা হেদায়েতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতাকে ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি; আর তারা হেদায়েতও পায়নি।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৬)

তারা বোঝে না যে দুনিয়ার ক্ষণিকের লাভের জন্য আখিরাতকে বিসর্জন দেওয়া ঠিক হবে না।

তারা আলোর কাছে আসে না : বিশ্বনবী (সা.) দিনের আলো তথা কোরআন নিয়ে এসেছেন এবং সর্বত্র দিনের আলো প্রজ্বলিত করেছেন। কিন্তু মুনাফিকরা সে আলো থেকে উপকৃত হতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘তাদের উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে (অন্ধকারে) আগুন জ্বালিয়েছে; কিন্তু যখন তা তার চারপাশ আলোকিত করল, তখন আল্লাহ তাদের আলো অপসারিত করে তাদের ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিয়েছেন, যাতে তারা কিছুই দেখতে পায় না।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৭)

তারা বধির, মূক ও অন্ধ : মুনাফিকরা হক কথা শোনার ব্যাপারে বধির, তারা হক কথা শোনে না, সত্য কথা বলার ব্যাপারে মূক ও বোবা এবং সত্য কথা বলে না। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার ব্যাপারে অন্ধ। আল্লাহ তাআলা সুবিধাভোগীদের অবস্থা বর্ণনা করেন, ‘তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। তারা (হকের দিকে) আদৌ ফিরে আসবে না।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৮)

তারা সন্দেহপ্রবণ, দ্বিধাগ্রস্ত ও সুবিধাবাদী : মুনাফিকরা সুবিধা ভোগের জন্য ইসলামে দাখিল হয়; কিন্তু ইসলামের বিধিবিধান পালন ও ইসলামের আনুগত্যের কষ্ট স্বীকার করতে রাজি নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘(তাদের উদাহরণ হলো) বর্ষাঋতুর ঘন মেঘের মতো, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক; বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তারা তাদের কানে আঙুল ঢুকিয়ে দেয়; আল্লাহ এসব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী লোকদের সর্বদিক দিয়ে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। অর্থাৎ তারা আল্লাহর আয়ত্তের ভেতরে আছে, তিনি তাদের সম্পর্কে জানেন।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৯)

সুসময়ের সঙ্গী : মুনাফিকরা মুসলমানদের সুখ-শান্তি দেখলে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। আর যখন মুসলমানরা দুখ-কষ্ট ও বিপদাপদে পতিত হয়, তখন নীরবে কেটে পড়ে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘বিদ্যুৎ চমক যেন তাদের দৃষ্টিশক্তিকে ছিনিয়ে নেয়। যখনই তারা তাদের একটু আলো দেয়, তারা পথ চলে, আর যখনই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখনই থমকে দাঁড়ায়।’ অর্থাৎ সুসময়ে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে, আর যখন বিপদ দেখতে পায়, তখন সিটকে পড়ে এবং পূর্বের নিফাকিতে অবিচল ও অটল থাকে।

মিথ্যাবাদী : মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।’ (সূরা : মুনাফিকুন, আয়াত : ১)

আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারী : মুনাফিকরা মানুষদের আল্লাহর দিকে আসতে দেয় না। তারা নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ।’ (সূরা : মুনাফিকুন, আয়াত : ২)

অহংকারী : মুনাফিকরা অহংকারী ও দান্তিক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আপনি তাদের দেখবেন যে তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।’ (সূরা : মুনাফিকুন, আয়াত : ৬)

প্রতারক : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘অবশ্যই মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা করছে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুত তারা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন একান্ত শিথিলভাবে লোকদেখানোর জন্য দাঁড়ায়। তারা আল্লাহকে অল্লই স্মরণ করে। এরা দোদুল্যমান অবস্থায় বুলন্ত; এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়।’ (সূরা : নীসা, আয়াত : ১৪৩-১৪৪)

মুনাফিকদের আরো অসংখ্য বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি কোরআন ও হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এসব থেকে হেফাজত করুন, আমিন!

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৭৯৮>

আমাদের প্রতিটি কাজ হোক একমাত্র আল্লাহর জন্য

Taalibul ilm

Super Moderator

১০-২৩-২০১৭

কিছুদিন আগে বিমানবন্দর গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, এক আত্মীয় বিদেশ থেকে আসবেন তাকে এগিয়ে আনা। বড় ভালো মানুষ, দ্বীনদার, সাদাসিধা মানুষ। বাড়িতে ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিজন থাকলেও সংসারের দায়ে সুদূর কুয়েতে পাড়ি দিতে হয়েছে। নিজের দুই ছেলেই ছোট হওয়ায় বাড়িতে আসার সময় আমাকেই বিমানবন্দরে থাকতে বলেছেন, যাতে তার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারি।

যথাসময়ে বিমান অবতরণ করল, সাক্ষাৎ হল, কথা হল, একে অপরের খোঁজ খবর নিলাম। এরই মধ্যে আমাকে হাদিয়াও দিলেন। একটি রুমাল ও একটি আতর, মূল্যবান হাদিয়া। অতপর বাড়ি যাওয়ার ফিকির। তিনি সায়েদাবাদ আসবেন তাই একটি ছোট গাড়ির প্রয়োজন। বেশ কয়েকজন চালকের সাথে কথা বললেন। তাদের যে চাওয়া, তাতে আমরা সম্মত হতে পারলাম না। আর তিনি যেহেতু হালাল উপার্জন করেন এবং রোজগারের পরিমাণও প্রচুর নয়, তাই অন্য দশজন বিদেশ প্রবাসীর মত চোখবুজে অর্থ ব্যয় বা নষ্টও করেন না। অবশেষে একজন চালক আমাদের কথামত রাজী হলেন। চালক বললেন, আসলে এই ভাড়ায় কাউকে নিই না, শুধু আপনারা যেহেতু ‘হুযুর মানুষ’ তাই রাজী হলাম। যাইহোক আমরা গাড়িতে চড়লাম, গাড়ি চলতে শুরু করল।

কুয়েতের খবরাখবর এবং নিজ দেশের খবরাখবর নিয়েই আমাদের কথাবার্তা চলছিল। একপর্যায়ে আমার হাতে রাখা তার দেয়া রুমালটির দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি রুমালটি মাথায় দিয়ে রাখতেন তাহলে সম্ভবত চালক আমাদের থেকে ভাড়া আরো কম নিত।

আরব দেশে আরবী রুমালের সম্মান আলাদা। যারা এ রুমাল পরিধান করেন তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখা হয়। বিশেষভাবে যদি শরশ্রমশ্রিত দ্বীনদার হন। অনেক ক্ষেত্রেই অন্যরা তাদেরকে সম্মান করে, অফিস আদালত বাজার-ঘাট গাড়ি ইত্যাদিতে তাদের থেকে অন্যের তুলনায় খয়খরচা কিছুটা কম নেয়ার চেষ্টা করে।

সে প্রচলন হিসেবেই তিনি আমাকে এ কথাটি বললেন। তবে কোনো লৌকিকতা নিয়ে নয়, অত্যন্ত সাদাসিধা খোলামনে, নির্লিপ্তভাবে। উত্তরে আমি তাকে কিছু বললাম না। তবে মনে একটি উদ্বেগ তৈরী হল। এতে ইতিবাচক দিকটিতো স্পষ্ট। দ্বীনের সাধারণ চর্চা থাকায় ওখানকার সাধারণ মানুষের মাঝেও দ্বীনের গুরুত্ব ও দ্বীনদারদের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়টি হল, সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য দ্বীনদারীর সূরত গ্রহণ করলে তো সব বরবাদ।

আমাদের সালাফ এ বিষয়ে কত সংবেদনশীল ছিলেন তা বিভিন্ন ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

সম্ভবত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর কিতাবুয যুহুদ-এ পড়েছি, এক ব্যক্তি একাগ্রচিন্তে, ধ্যানমগ্ন হয়ে, যেন আল্লাহ তাকে দেখছেন এমন হালত নিয়ে তাওয়াফ করছে। এক লোক তা লক্ষ্য করল এবং ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করতে থাকল যখন ঐ ব্যক্তির তাওয়াফ শেষ হল তখন এক থলে দিরহাম তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এত সুন্দর তাওয়াফ আপনার। এগুলো আপনার জন্য হাদিয়া। তাওয়াফের লোকটি থলেটি নিয়ে এমনভাবে ছুড়ে ফেললেন, থলে ছিঁড়ে দিরহামগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল এবং বললেন, আমি কি আমার তাওয়াফ বিক্রি করে দিব?

শামের বিখ্যাত তাবেরী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুহায়রীয, যেমন তিনি ইলমের ক্ষেত্রে ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত তেমনি ছিলেন ইবাদত-বন্দেগীতে। তিনি একদিন এক দোকানে গেলেন কাপড় কিনতে। তখন এক ব্যক্তি দোকানীকে বলল, ভাই! ইনি ইবনে মুহায়রীয, তাঁর সাথে সুন্দরভাবে বেচা-কেনা কর। অর্থাৎ দাম কিছু কমিয়ে ধর। কথাটি শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহায়রীয রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং দ্রুত দোকান ত্যাগ করতে করতে বললেন,

إنما جئنا لنشتري بدارهمنا، ليس بديننا.

‘আমি তো আমার দিরহাম দিয়েই ক্রয় করতে এসেছি, দ্বীন দিয়ে নয়।’ Nকিতাবুয যুহুদ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, পৃ. ৩০৯ (২২৪২)

কাকরাইল মসজিদের মাওলানা রবীউল হক দামাত বারাকাতুহুম প্রায় সময় হেদায়েতী বয়ানে উপমা দিয়ে বলেন, ভাই, আলীর সাহেবের দাম দুই টাকা।

কীভাবে? আমীর সাহেব কোনো কিছু কিনতে দোকানে যান, জিনিসটার দাম দশ টাকা হলে দোকানদার বলে, আমীর সাহেব সবার কাছে দশ টাকায় বিক্রি করি আপনি দুইটাকা কম দেন। আপনি আট টাকা দিলে হবে।

চিন্তা করলে দেখা যায়, আমরা কতভাবে আমাদের নেক কাজ ও আখেরাতের আমলগুলো দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করি।

ইবাদত-বন্দেগী ঠিকই করছি তবে মন চায় মানুষ তা দেখুক এবং তা প্রচার হোক। তাই লোকচক্ষুর আড়ালের ইবাদত আর জনসম্মুখের ইবাদত এক হয় না। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করি অথবা দ্বীনী কাজ করি, উদ্দেশ্য থাকে, আমি পরিচিত হই প্রসিদ্ধ হই, সবাই আমাকে চিনুক, জানুক। একজনের খামোখা প্রশংসা করছি যা বাস্তবে আমার দিলে নেই, যাতে সে আমাকে তার ভক্ত অনুরক্ত মনে করে আমার প্রতি খুশি থাকে। সময়মত আমার তার প্রয়োজন পড়তে পারে। যাকে বাংলায় চাটুকারিতা বলে।

মোটকথা, চিন্তা করলে এমন অনেক কাজ পাওয়া যাবে, যা দ্বীন ও আখেরাতের বিষয়, কিন্তু উদ্দেশ্য হল দুনিয়া; তথা অর্থ কড়ি, নাম, প্রসিদ্ধি, অন্যের সম্ভৃতি অথবা অন্য কোনো ধরনের স্বার্থ। আর বলতে গেলে এসবের সর্বনিকৃষ্ট হলো আখেরাতে কাজ দিয়ে মূল্যহীন দুনিয়া কামাই করা।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহ. বলেন,

إن أفصح الرعية، أن يطلب الدنيا بعمل الآخرة.

এমনিই তো কুরআন হাদীসে শিরক, রিয়া, নাম, প্রসিদ্ধি, লোক দেখানো, দ্বীন দিয়ে দুনিয়া কামাই ইত্যাদির খুবই নিন্দা এসেছে। সেগুলো ভালো কাজ নয়। এই ইলম তো সবারই আছে। কিন্তু এ কাজগুলো এমন সূ^২ভাবে আমাদের কাজে-কর্মে ও নিয়তে প্রবেশ করে যে, আমরা বুঝতেই পারি না, আমি অমুকটিতে লিপ্ত। আর বাহ্যতও তা দ্বীনী আমল হওয়াতে এর আড়ালে যে অন্য কিছু থাকতে পারে, আমার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ সহজে তা অনুমান করতে পারে না। ফলে কেউ আমাকে শুধরে দিতেও পারে না। তবে একথা তো সকলের কাছে পরিষ্কার যে, এমনটি হলে আখেরাতে এসব কাজের সামান্যতম প্রতিদান পাওয়া যাবে না। সাথে সাথে

এসব কাজ করার অর্থ আল্লাহর কাজ দিয়ে অন্যের সন্তুষ্টি চাওয়া, যা শিরকের নামাস্তর অথবা আল্লাহর কাজ দিয়ে দুনিয়া কামাই করা যা চরম হীন ও ঘৃণ্য।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ‘আবরার’গণের (নেককার মুমিনদের) বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.

(তরজমা) ‘এবং তাঁরা খাবারের চাহিদা সন্তোঃও তা মিসকীন, ইয়াতীম, বন্দিদের খাওয়ায়। আর বলে, আমরা তো একমাত্র আল্লাহর জন্য খাওয়াই। তোমাদের থেকে না আমরা কোনো বিনিময় চাই, না কৃতজ্ঞতা। Nসূরা দাহর (৭৬) : ৮,৯

মূলত মুমিনগণ একথা মুখে বলেননি, তাদের অন্তরের আবেগ, অনুধাবন এমনই ছিল। এবং সেভাবেই আল্লাহ তাআলা বিষয়টি তুলে ধরেছেন। প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, আসলে তারা তা মুখে বলেননি, তবে আল্লাহ তাআলা বিষয়টি তাদের অন্তর (ও কর্ম) থেকে বুঝেছেন, তাই এ বিষয়ে তাদের প্রশংসা করেছেন, যেন কোনো উৎসাহী উৎসাহ লাভ করে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৮/২৮৯)

এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে লক্ষ করা দরকার। আমরা কাউকে কোনো কিছু দিলে বা কোনো উপকার করলে মনে মনে তার প্রতি দাবি রাখি, সে আমার কল্যাণকামী হবে, আমাকে হাদিয়া দিবে, অন্তত পরবর্তীতে আমার উপকার করবে। আমার উপকারের কথা মানুষকে বলবে, কমপক্ষে আমার নিকট স্বীকার করবে ও ছোট হয়ে থাকবে এবং আমাকে সর্বদা ধন্যবাদ দিবে। তাই যদি কখনো সে আমাকে কষ্ট দেয় আমি তখন খোটা দিয়ে বসি। তোমার না আমি এই এই উপকার করেছি?! তেমনিভাবে কোনো লোক আমার উপকার গ্রহণ করে যদি ধন্যবাদ না দেয় তখন আমরা বলতে শুরু করি, এত কিছু করলাম একটু ধন্যবাদও দিল না! কিন্তু ভেবে দেখা দরকার এ আয়াত আমাদেরকে কী বলে?! কুরআন মাজীদে আশ্বিয়া কেরামের দাওয়াতের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা যাদের কথাই বলেছেন।

একটি কথা মোটামুটি সবার ব্যাপারেই উল্লেখ করেছেন। তা হল, তারা প্রত্যেকে স্বগোত্রকে বলেছেন,

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ.

আমি)এ আহ্বানের জন্য(তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান আল্লাহ দিবেন। Nসূরা হুদ (১১) : ২৯

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেন **أجر** শব্দটি নাকিরা (অনির্দিষ্ট)। অর্থাৎ যে কোনো ধরনের প্রতিদান, ছোট হোক বা বড়। অর্থ হোক বা যশ-খ্যাতি, প্রসিদ্ধি-সম্মান কিংবা যে কোনো ধরনের সেবা বা চাওয়া-পাওয়া। এই ছিল আশ্বিয়ায়ে কেরামের ইখলাস ও অন্তরের হালত।

যদিও অনুগ্রহ গ্রহণকারীর কর্তব্য, ‘জাযাকাল্লাহু খাইরান’ বলা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

প্রখ্যাত সাহাবী আবু মাসউদ রা. এক ব্যক্তির কোনো এক প্রয়োজন নিয়ে শাসকের সাথে কথা বললেন, এবং শাসক তা পূর্ণ করে দিলেন। যখন তিনি ঘরে ফিরলেন, দেখলেন তার জন্য কেউ একটি হাঁস ও একটি মুরগী পাঠিয়েছে। ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করলে তারা ঐ লোকটির নাম বলল, যার প্রয়োজন নিয়ে তিনি শাসকের কাছে গিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, এগুলো বের করে দাও। আমি কি আমার সুপারিশের বিনিময় দুনিয়াতেই নিয়ে নিবো। Nকিতাবুয যুহুদ, আহমাদ ইবনে হাম্বল,

পৃ.২৩৫

রবী ইবনে সবীহ বলেন, আমরা একদিন হাসান বসরীর নিকট ছিলাম, তিনি আমাদেরকে ওয়াজ করলেন। হঠাৎ এক লোক ওয়াযের প্রভাবে চিৎকার করে উঠল, তখন হাসান বসরী তাকে বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তোমাকে এ চিৎকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী ছিল। Nকিতাবুয যুহুদ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, পৃ.২১৯

সাহাবী আবু উমামা রা. একদিন মসজিদে এসে দেখেন, এক ব্যক্তি নামায পড়ছে এবং সেজদায়ে গিয়ে খুব কাঁদছে ও দুআ করছে। তখন আবু উমামা রা. লোকটিকে বললেন, ‘তুমি তুমিই (অর্থাৎ তোমার এসব সত্য) এমনটি যদি তুমি ঘরেও করে থাক।’ Nপ্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

ইবরাহীম ইবনে আদহাম রাহ. বলেন,

لم يصدق الله عز وجل من أحب الشهرة.

যে)নেক কাজ করে) প্রসিদ্ধি কামনা করে সে আল্লাহর সাথে সত্যবাদী নয়।
Ñপ্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯

হযরত লুকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘হে বৎস! তুমি মানুষদেরকে এমনটি দেখাবে না যে, তুমি (ইবাদাত বন্দেগী করে) আল্লাহকে ভয় করছো, যেন তারা তোমাকে সম্মান করে, অথচ তোমার অন্তর নাফরমান।
Ñপ্রাগুক্ত

আব্দুস সামাদ ইবনে আলী মদীনার গভর্নর থাকাকালীন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে একটি বিষয়ে কথা বলল। তা শুনে তিনি তাকে বললেন, মনে হচ্ছে তুমি রিয়াকারী (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এমনটি বলছ)। তখন লোকটি যমিন থেকে একটি কাঠি বা এ জাতীয় কিছু হাতে নিয়ে বললেন, আমি আমার আমল কাকে দেখাবো?

আল্লাহর শপথ আমার নিকট সকল মানুষ এ কাঠি থেকেও তুচ্ছ (অর্থাৎ আল্লাহর তুলনায়)। Ñসিফাতুস সাফওয়াহ ২/৪৩৩

যাইহোক, রিয়া বিষয়টি যেমন বিস্তৃত তেমন সূ^২ও। অনেক ক্ষেত্রে তো আমরা বুঝে শুনে ইচ্ছা করেই এমন করি বা অনেক কিছু আমাদের সমাজের নিয়মেও পরিণত হয়ে গিয়েছে। আবার অনেক সময় আমাদের আমলের মাঝে রিয়া এত সূ^২ভাবে প্রবেশ করে, নিজেরাও ধরতে পারি না। এ থেকে বাঁচার জন্য করণীয় হল, বেশি বেশি ইখলাসের মুযাকারা করা, প্রত্যেক কাজে নিয়তের মুহাসাবা করা। আর বিষয়টি বাস্তবেও সুকঠিন।

আল্লাহর কাজ দিয়ে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য করা আল্লাহর নিকট শিরক এবং অসহনীয়। হাদীসে এসেছে, যে অন্যকে দেখানোর জন্য নামায পড়ল সে শিরক করল, যে অন্যকে দেখানোর জন্য রোযা রাখল সে শিরক করল। যে অন্যকে দেখানোর জন্য দান করল সে শিরক করল। Ñমুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী, হাদীস ১২১৬

একজন সুস্থ বিবেকবান মানুষের নিকটও তা নিতান্তই অপসন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। এবং এটা অযৌক্তিকও বটে। আমি যাকে উদ্দেশ্য করে কাজটি করছি সে কে? আল্লাহর সামনে সে কতটুকু? মাটির নিচে তার সম্ভ্রুটি আমার কী কাজে আসবে? দ্বীনের ধারক-বাহকগণ বিষয়টি কত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইয়াইয়া ইবনে আবী কাছীর বলেন, তোমরা নিয়ত শেখ। কেননা তা আমল থেকেও বেশি কার্যকরি। Ñজামিউল উলূম ওয়াল হিকাম পৃ. ২৬

হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহ. বলেন, আমি নিয়তকে বিশুদ্ধ করতে যত কঠিন সাধনা করেছি অন্য কোনো কিছুই ক্ষেত্রে এমন সাধনা করিনি। কেননা যতবারই আমি নিয়ত ঠিক করি, নিয়ত আমার বিপরীতে চলে আসতে চায়। Ñপ্রাপ্ত

হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত রাহ. বলেন, নিয়তকে রিয়ামুক্ত ও বিশুদ্ধ করা দীর্ঘ মুজাহাদা ও ইবাদাত-বন্দেগী করা থেকেও অনেক কঠিন। Ñপ্রাপ্ত

আল্লাহ তাআলা সকলকে ইখলাস নসীব করুন। রিয়া থেকে হেফাজত করুন। প্রতিটি কাজ যেন একমাত্র তাঁরই সম্ভ্রুটির জন্য করতে পারি সে তাওফিক দান করুন।

সূত্রঃ আল-কাওসার

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮০২৬>

তামকিয়াতুন নারুস: নিজের দ্বীনি ভাইদের প্রতি ধৈর্য ধারণ করা

আবু ফাতিমা

Member

১১-২১-২০১৭

আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারকাতুহ

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন। আসসালাতু অয়াসসালাম আ'লা রাসূলিলীল কারিম। আ'ম্মাবা'দ।।

দ্বীনি কাফেলায় শরীক ভাইদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হল ধৈর্য ধারণ করা। দ্বীনের বুঝ পাওয়ার পর থেকে শুরু করে দিন যত সামনের দিকে অতিবাহিত হতে থাকবে এই গুণ ভাইদের জন্য ততই বেশি জরুরী হয়ে পরবে। মনে করে দেখুন আপনি যখন প্রথম দ্বীনের বুঝ পেলেন সেই সময়ের কথা। একজন ভাই (দাঈ) আপনার পিছনে দিনের পর দিন ধৈর্য সহকারে আপনার ইসলামে করার চেষ্টা করেছে। আপনি/আমি অবুঝের মত অনেক উলটা/পালটা প্রশ্ন করেছি সেগুলোর প্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে সেগুলোর উত্তর জুগিয়েছেন। অতঃপর আপনি আমি এই কাফেলার দিকে অগ্রসর হতে পেরেছি। তাই আমি আপনি যেমন কোন একজন দাঈর (হোক সেটা অফলাইনে কারও সামনা সামনি প্রচেস্টার দ্বারা অথবা অনলাইনে কোন শায়খের বয়ানের দ্বারা) অনেক ধৈর্যের ফসল তেমনি দ্বীনের চাহিদা এটা যে আপনি/আমিও আমাদের কাজে (হোক সেটা দাওয়াহ কাজ বা সাংগঠনিক অন্য কাজ) ধৈর্যশীল হবে। মানুষ হিসেবে আমাদের একটা ফিতরাত এমন যে আমরা নিজেদের ব্যপারে (হোক সেটা নিজ পরিবার বা নিজ তয়িফা বা নিজ কাজের পরিমন্ডলে থাকা ভাইদের ব্যপারে) কিছুটা কম ধৈর্যশীল হই। কারন নিজেদের ক্ষেত্রে এই বোধ কাজ করে যে আমি যদি এটা বুঝে থাকি তাহলে আমারই পরিবারের সদস্য বা আমার তয়িফার একজন বা আমার সেকশনের একজন ভাই কেন এটা বুঝবেন না; তাদের থেকে কোন ভুল কিছু পেয়ে থাকলে অনেক সময় এমন প্রতিক্রিয়া দেখাই যাতে করে কর্ম পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে যায়।

এজন্য আমাদের সকলের উচিত সকলের প্রতি সমভাবে ধৈর্যশীল হওয়া। মনে রাখা দরকার আল্লাহ সুবহানুতা'আলা অনেক মায়া করে অনেক অনুগ্রহ করে আপনাকে এই কাফেলায় শরীক করেছেন সুতরাং আপনার একটা মুহূর্তের অধৈর্য আচরণের কারণে যেন আপনার কোন ভাই বা অন্য কেউ কষ্ট পেয়ে এই কাফেলার প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ না করেন। এই কাফেলার ইজ্জত, সম্মানের হেফাজত করা আমার আপনার সকলের জিহাদারি। আমাদের ব্যক্তিগত ক্রটি যেন আমাদের এই কাফেলাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। পাশাপাশি এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে আমরা কখনই আমাদের চাহিদামত সবকিছু পাব না। বরং এটাই সত্য যে বেশিরভাগ জিনিস হবে আপনার চাহিদার বিপরীত। খুব ছোট একটা উদাহরণ লক্ষ্য করেনঃ

ধরা যাক, ২ জন ভাই একসাথে এক রুমে থাকা হয়। একজনের বাড়ি সিলেট এবং একজনের বাড়ি দিনাজপুর। বাস্তবতা হিসাব করলে দেখা যাবে খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে রুচি, পছন্দ সবকিছুই আলাদা। একজন তরকারিতে ঝাল পছন্দ করবে একজন ঝাল হলে খেতেই পারবে না। একজন হয়ত গোশত খেতে পছন্দ করবে আরেকজন হয়ত সবজি পছন্দ করবে। এভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থা বিপরীতমুখী হবে। এখন এই ২ ভাই যদি পরস্পরের ব্যাপারে ধৈর্যশীল না হন তাহলে ১০ দিনও একসাথে থাকার সুযোগ হবে না।

তাই প্রিয় ভাই, আজকে আপনার সাথী ভাই, আপনার মামুর ভাই, আপনার মাসুল ভাই প্রত্যেকের ব্যাপারে আপনারা ধৈর্যশীল হোন। কারণ এই পথে দেখবেন একেক জনের ধরণ একেক রকম। আর তাদের সাথে যদি আপনি মানিয়ে চলতে না পারেন তাহলে জিহাদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম (র.) এজন্য বলেছেন-

" তোমাকে অবশ্যই তোমার ভাইয়ের প্রতি ধৈর্য ধারণ করতে হবে যে তোমার সাথে জিহাদে যোগ দিয়েছে, এবং শত্রুর দিকে আক্রমণের ধৈর্য থেকেও অনেক বেশি কষ্ট নিজের ভাইয়ের প্রতি ধৈর্য ধারণ করা, এবং এখানে এটা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই তোমার জন্য, তুমি জিহাদের ভূমিতে সমস্ত মানুষকে তোমার চাহিদা মত পাবে না, এবং তোমাকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে অন্য পানি

এবং খাবারের সাথে, প্রকৃতি এবং পাহাড়ের সাথে, অন্যথায় তুমি কখনো জিহাদ করতে পারবে না।"

আর দিনশেষে বিজয় ত তারই জন্য যিনি ধৈর্যের সাথে লক্ষ্যের পানে অবিচল থাকতে পারল।

আল্লাহ সুবহানুতা'আলা আমাদের তৌফিক দান করুন। আমিন।

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র আমাদের রবের জন্য এবং দরুদ ও সালাম সাইয়্যেদুল আশ্বিয়া মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার এবং সাহাবি আযমাদ্বিনগনের প্রতি।

আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারকাতুহা।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮২১৪>

মানুষের অন্তর নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা (অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ ও প্রতিকার)কালো পতাকা আইডি'র একটা অনুবোধ

কালো পতাকা

Senior Member

১২-০৯-২০১৭

মানুষ কেবল দেহসর্বস্ব জীব নয়। সুন্দর দৈহিক অবয়বের সাথে মহান আল্লাহ মানুষকে সুন্দর একটি ক্লব বা অন্তর দিয়েছেন। যার মাধ্যমে মানুষ চিন্তা করে জীবনের ভাল-মন্দ বেছে নেয়। মানুষের অন্তরের চিন্তা-ভাবনার উপরই নির্ভর করে তার অন্যান্য অঙ্গের ভাল কাজ বা মন্দ কাজ সম্পাদন করা। এই ক্লব বা অন্তরেই মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকীদার অবস্থান। আর আল্লাহ বান্দার অন্তরই দেখেন।

[১] এই ক্লব বা অন্তর হ'ল পরিকল্পনাকারী এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বাস্তবায়নকারী। অন্তর ভাল থাকলে, মানুষের কাজও ভাল হবে।

[২] অন্তর বা মন খারাপ থাকলে, কাজে মনোযোগ থাকে না। কাজ হয় অগোছালো, অসুন্দর। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় এই অন্তরেরও রোগ-ব্যাধি হয়ে থাকে। শরীরের অন্যান্য রোগের কথা মানুষ জানলেও অন্তরের রোগ সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ। ফলে অধিকাংশ মানুষের অন্তর সুস্থ না থাকার কারণে পাপ কাজ করেই যাচ্ছে। আল্লাহর আযাবের কথা শুনেও কর্তপাত করছে না। অন্তর কঠিন হওয়া অন্তরের একটি অন্যতম রোগ। অন্তর কঠিন হ'লে মানুষ আল্লাহর আযাব ও জাহান্নামের শাস্তির কথা শুনে বিগলিত হয় না।

আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন'। (বাক্বারা ২/৭৪)

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

وَلَكِنْ فَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

বস্তুতঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল। (আন‘আম ৬/৪৩)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

فَوَيْلٌ لِلْفَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ-

‘যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে’। (যুমার ৩৯/২২)]

আল্লাহ আরো বলেন,

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ

‘তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে’। (হাদীদ ৫৭/১৬)

অন্তর কঠিন হওয়ার আলামত~

(১) আল্লাহর আনুগত্য ও ভালকাজে অলসতা:

মানুষের অন্তর কঠিন হ’লে ইবাদতে অলসতা চলে আসবে। ছালাত পড়বে কিন্তু অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে না। ছালাতে নফল ও সুন্নাত আদায়ের পরিমাণ কমে যাবে। মুনাফিকদের চরিত্র প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

‘তারা ছালাতে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সংকুচিত মনে’। (তওবা ৯/৫৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ -

‘যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায় তখন তারা অলসভাবে দাঁড়ায়’। (নিসা ৪/১৪২)

(২) আল্লাহর আয়াত ও উপদেশ শুনে অন্তর প্রভাবিত না হওয়া:

অন্তর কঠিন হ'লে মানুষ কুরআনের আয়াত শুনে বিশেষ করে আযাবের আয়াতগুলি শুনে ভীত হয় না; বরং কুরআন পড়া ও শোনাকে নিজের কাছে ভারী মনে হয়। আল্লাহ বলেন,

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ

‘অতএব যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন’। (কাফ ৫০/৪৫)

অন্যত্র আল্লাহ মুমিনদের প্রশংসা করে বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ -

‘যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াত, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা করে’। (আনফাল ৮/ ২)

(৩) দুনিয়াতে আল্লাহর আযাব-গযব ও মানুষের মৃত্যু দেখে অন্তর ভীত না হওয়া:

মানুষ সাধারণত আযাব-গযব ও নিকটজনের মৃত্যু দেখলে ভীত হয়। কিন্তু কেউ যদি ভীত না হয়, ভাল আমল না করে, খারাপ আমল ছেড়ে না দেয়, তাহ'লে বুঝতে হবে তার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।

আল্লাহ বলেন,

أُولَٰئِكَ يَرْوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ

‘তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতিবছর তারা দু’একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না’। (তওবা ৯/১২৬)

(৪) দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাওয়া ও আখেরাতকে ভুলে যাওয়া:

মুমিনদের আসল বাসস্থান হ'ল জাহ্নাত। দুনিয়া হ'ল আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। যদি কেউ আখেরাতের কথা ভুলে দুনিয়া অর্জনের পিছনে লেগে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে তার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।

(৫) আল্লাহকে সম্মান করা কমে যাওয়া: আল্লাহকে সম্মান না করার অর্থ হ'ল আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে মান্য না করা। সুতরাং কেউ আল্লাহর আদেশকে মান্য না করে নিষেধগুলিতে ডুবে থাকলে বুঝতে হবে লোকটির অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।

অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ~

অন্তর কঠিন হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হ'লঃ-

(১) অন্তরকে দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত রেখে আখেরাতকে ভুলিয়ে রাখা:

এটা হচ্ছে অন্তর কঠিন হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। যদি দুনিয়ার ভালবাসা আখেরাতের ভালবাসার চেয়ে প্রাধান্য পায়, তাহ'লে ধীরে ধীরে অন্তর কঠিন হ'তে আরম্ভ করে। ফলে ঈমান কমে যায়, সৎ কাজকে ভারী মনে হয়, দুনিয়াকে ভালবাসা আরম্ভ করে এবং আখেরাতকে ভুলে যেতে থাকে। জনৈক সৎ বান্দা বলেছেন,

"مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ عَيْنَانِ فِي وَجْهِهِ يُبْصِرُ بِهِمَا أَمْرَ الدُّنْيَا، وَعَيْنَانِ فِي قَلْبِهِ يُبْصِرُ بِهِمَا أَمْرَ الْآخِرَةِ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتَحَّ عَيْنَاهِ اللَّتَيْنِ فِي قَلْبِهِ فَأَبْصَرَ بِهِمَا مَا وَعَدَ اللَّهُ بِالْغَيْبِ، فَأَمِنَ الْغَيْبَ بِالْغَيْبِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَكَهُ عَلَى مَا فِيهِ. ثُمَّ قَرَأَ: {أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْئَالُهَا} [محمد: 24]"

‘প্রত্যেক বান্দারই দু’টি চোখ রয়েছে। এক চোখ দিয়ে সে দুনিয়ার বিষয় দেখে। আর অন্তরে যে চোখ আছে তা দিয়ে সে আখেরাতের বিষয় দেখে। আল্লাহ যদি কোন বান্দার কল্যাণ চান, তাহ'লে তার অন্তরে যে চোখ আছে তা খুলে দেন। ফলে আল্লাহ অদৃশ্যের যে ওয়াদা করেছেন সে সেগুলি দেখতে থাকে। আর আল্লাহ যদি অন্য কিছু ইচ্ছা করেন, তাহ'লে তার অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেন। তারপর এ আয়াতটি পাঠ করেন, ‘তাদের অন্তর কি তালাবদ্ধ করা হয়েছে’। (মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)

(২) অলসতা:

এটা একটা সংক্রামক ব্যাধি। অন্তর এ রোগে আক্রান্ত হ'লে শরীরের সব অঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়ে। শরীরের সব অঙ্গ কর্মক্ষমতা হারায়।

আল্লাহ বলেন,

-أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
'তারা হ'ল সে সমস্ত লোক যাদের অন্তর, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন'। (নাহল ১৬/১০৮)

আল্লাহ মানুষকে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন, মানুষের উচিত সেগুলি সঠিকভাবে কাজে লাগানো। অন্যথা সেই গাফেলদের জন্য আল্লাহ আযাবের ব্যবস্থা রেখেছেন।

আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ -

আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু তারা তদ্বারা দেখে না। তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা তারা শোনে না। তারাই হ'ল পশুর ন্যায় বরং তা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হ'লো গাফিল বা অমনোযোগী'। (আ'রাফ ৭/১৭৯)

(৩) খারাপ বন্ধুদেরকে ভালবাসা ও তাদের সাথে উঠা-বসা করা:

কথায় আছে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। মানুষ যার সাথে চলাফেরা করে তার আচার-আচরণ অন্য জনের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ، لَا

يَعْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكَيْزُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ
تُؤَبِّكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.

‘সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়।
আতর বিক্রেতার থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে,
না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার
কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে’। [৩]

ইবনে মাসউদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলব, যে কোন সম্প্রদায়কে
ভালবাসে অথচ তাদের সাথে সাক্ষাত হয়নি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম) বললেন,

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

মানুষ তার সাথেই থাকবে সে যাকে ভালবাসে’। [৪]

অন্য হাদীছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فِي
مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ عَلَى
لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

‘বনু ইসরাঈলরা যখন পাপাচারে লিপ্ত হ’ল, তখন তাদের আলেম দরবেশগণ
প্রথমদিকে এইসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করত। কিন্তু লোকেরা বিরত না হওয়ায় পরে
তারা দুষ্টমতি সমাজ নেতা ও বড়লোকদের সাথে উঠা-বসা ও খানাপিনা করত।
ফলে আল্লাহ তাদের পরস্পরের অন্তরকে পাপাচারে কুলষিত করে দেন। অতঃপর
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উপর লা’নত করেন’। [৫]

(৪) অধিক হারে গুনাহ ও খারাপ কাজ করা:

অধিক হারে পাপ বান্দার অন্তরকে কঠিন করে তোলে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نَكَتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَاءٌ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَعْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَغْلُو قَلْبُهُ وَهُوَ الرَّأْسُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

‘যখন বান্দা কোন পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যখন সে তওবা করে, তখন সেটা তুলে নেওয়া হয়। আর ইস্তেগফারের মাধ্যমে অন্তরকে পরিষ্কার করা হয়। আর যদি পাপ বাড়তেই থাকে, তাহ’লে দাগও বাড়তে থাকে। আর এটাই হ’ল মরিচা। যেমন আল্লাহ বলেন, না এটা সত্য নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচারূপে জমে গেছে’। (মুতাফফিফীন ৮৩/১৪) আহমাদ, তিরমিযী)

(৫) মৃত্যুর কষ্ট ও আখেরাতের আযাব ভুলে যাওয়া:

মৃত্যু ও আখেরাতের চিন্তা মানুষের অন্তরকে নরম রাখে। কেউ মৃত্যুর কথা ও আখেরাতে জবাবদিহিতার কথা ভুলে গেলে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়।

অন্তর কঠিন হওয়ার প্রতিকার~

(১) আল্লাহ তা‘আলাকে চেনা:

অন্তর কঠিন হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রথম ও প্রধান উপায় হ’ল আল্লাহর রহমত, ক্ষমা, শাস্তি ও মর্যাদা জানার মাধ্যমে অন্তর নরম করার চেষ্টা করা এবং আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের জন্য ছুটে আসা।

আল্লাহ বলেন,

-غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ
‘পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন’। (গাফির ৪০/৩)

(২) কুরআন তিলাওয়াত করা:

কুরআন তিলাওয়াত করা ও এর অর্থ বুঝে আমল করার মাধ্যমে অন্তর নরম হয়।
আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ

‘(বিনয়ী হ’ল তারা) যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হ’লে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে’। (হজ্জ ২২/৩৫)

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) কুরআন দ্বারা কঠিন অন্তরের কিভাবে চিকিৎসা করতে হবে তা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন এভাবে- ‘এটির দু’টি পথ রয়েছে- এক- আপনার অন্তরকে দুনিয়া থেকে স্থানান্তর করে আখেরাতের দেশে নিয়ে যাবেন। দুই- অতঃপর কুরআনের অর্থ বুঝবেন এবং কেন নাযিল হয়েছে সেটা বুঝার চেষ্টা করবেন এবং প্রত্যেক আয়াত হ’তে আপনার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে তা আপনার অন্তরের ব্যথির উপর প্রয়োগ করবেন। তা যদি আপনার অসুস্থ অন্তরের উপর প্রয়োগ করেন, তাহ’লে আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ করবেন’। [৬]

(৩) অন্তরকে পরকালীন চেতনায় উজ্জীবিত করা:

অন্তরকে বুঝাতে হবে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরে রয়েছে স্থায়ী, অনাদি, অনন্ত আখিরাতের জীবন। সে জীবনের তুলনায় এ নশ্বর জীবন নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَاللَّهُ مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي النَّيَمِ فَلْيَنْظُرْ يَمَ يَرْجِعُ .

‘আল্লাহর কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ’ল যেমন তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি অঙ্গুলি ডুবিয়ে দেয়, এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল’। [৭]

জাবের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত,

একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি কানকাটা মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে একে এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে পসন্দ করবে? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা তো একে কোন কিছুর বিনিময়েই ক্রয় করতে পসন্দ করব না। তখন তিনি বললেন,

قَوْلَهُ لِلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ

‘আল্লাহর কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট’। [৮]

(৪) মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার কথা চিন্তা করা:

দুনিয়ার জীবনের পর সবাইকে মরতে হবে এবং দুনিয়ার জীবনের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে। এ চিন্তা ও বিশ্বাসই মানুষের অন্তর নরম করতে পারে। মরণের পর কবরে যেতে হবে, মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, হাশরের ময়দানে আমলনামা নিয়ে উঠতে হবে, আমল ভাল হ’লে জান্নাত, না হয় জাহান্নাম। একথা চিন্তা ও বিশ্বাসের মাধ্যমেই অন্তর নরম হয়। পক্ষান্তরে সে যদি পরকালের জবাবদিহিতার কথা ভুলে যায়, তাহ’লে তার অন্তর দুনিয়ার মায়ায় আচ্ছাদিত হয়ে কঠিন হয়ে যায়।

(৫) কবর যিয়ারত করা ও তাদের অবস্থা চিন্তা করা:

কোন মানুষ যদি কবরের কাছে গিয়ে এই চিন্তা করে যে, এই কবরে যে আছে সে একদিন দুনিয়াতে ছিল, আমার মত খাওয়া-দাওয়া করত, চলাফেরা করত। আজকে সে কবরে চলে গেছে, তার দেহ মাটি হয়ে গেছে, তার সম্পদ তার ছেলে-মেয়েরা ভাগ করে নিয়েছে। আমাকেও একদিন তার মত কবরে যেতে হবে। তাহ’লে অন্তর নরম হবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَرْزُوهَا، فَإِنَّهَا تَرِقُّ الْقُلُوبَ .

‘আমি প্রথমে তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা এটা অন্তরকে নরম করে’। [৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করেছিলেন। অতঃপর তিনি কেঁদেছেন এবং আশেপাশে যারা ছিল তাদের কাঁদিয়েছেন। অতঃপর বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আমার মায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার অনুমতি চেয়েছি, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। আমি আল্লাহর কাছে তাঁর কবর জিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছি। অতঃপর আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা এটা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়'। [১০]

(৬) আল্লাহর নির্দেশনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা:

আল্লাহ কুরআনে আযাব-গযবের অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। বিভিন্ন জাতি অবাধ্য হওয়ার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। চিন্তাশীল মানুষ যদি এগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন তাহ'লে তার অন্তর নরম হবে।

আল্লাহ বলেন,

كِتَابًا مَّتَشَافِهًا مَّتَّانِي تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ-

‘আল্লাহ উত্তমবাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশের মাধ্যম। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই’। (যুমার ৩৯/২৩)

(৭) বেশী বেশী আল্লাহর যিকর করা ও গুনাহ মাফ চাওয়া:

অন্তরের কঠিনতা যিকর ব্যতীত দূর হয় না। প্রত্যেকের উচিতঃ অন্তরের কঠিনতা দূর করার জন্য আল্লাহর যিকর করা।

একজন লোক হাসান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন,

يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذبه بالذكر.

‘হে আবু সাঈদ! আপনার নিকট অন্তর কঠিন হওয়ার অভিযোগ করছি, তিনি বললেন, তুমি (অন্তরের কঠিনতা থেকে বাঁচতে) যিকর করবে।

ইবনুল কাইয়্যাম (রহঃ) বলেছেন,

صداً القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وخلأوه بشينين: بالاستغفار والذكر.

‘দু’টি জিনিস অন্তরকে বন্ধ করে দেয়- অলসতা ও গুনাহ, এবং দুটি জিনিস এটাকে শূন্যতা করে- ক্ষমাপ্রার্থনা ও যিকির।

(৮) সৎ লোকদের সঙ্গী হওয়া ও তাদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করা:

সৎ লোকদের সাথে থাকা, তাদের সাথে চলাফেরা করা ও তাদের থেকে উপদেশ নেওয়ার মাধ্যমে মানুষের অন্তর নরম থাকে। আল্লাহ বলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.

‘আপনি নিজেকে তাদের সৎসঙ্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না’।

(কাহফ ১৮/২৮)

জাফর বিন সুলায়মান বলতেন,

‘كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرة إلي وجه محمد بن واسع ’
যখনই আমি আমার অন্তরের মধ্যে কঠিনতা লক্ষ্য করেছি, তখনই আমি মুহাম্মাদ বিন ওয়াছে-এর চেহারার দিকে লক্ষ্য করেছি’।

(৯) আত্মসমালোচনা করা:

মানুষ যদি নিজে নিজের দিকে না তাকায়, তাহ'লে সে তার অন্তরের রোগের অবস্থা জানতে পারে না। তাই মানুষের উচিত তার প্রতিদিনের কার্যকলাপের দিকে নিজেই লক্ষ্য রাখা এবং ভাল কাজ অব্যাহত রাখা ও মন্দা কাজ ত্যাগ করা।

(১০) দো'আ করা:

দো'আ প্রত্যেক মুমিনের প্রধান হাতিয়ার এবং অন্তরের কঠিনতা থেকে পরিব্রাণকারী। অন্তরের চিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত দো'আটি পড়া যায়, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করতেন,

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহুম্মা মুহরিফাল কুলূব ছাররিফ কুলূবানা ‘আলা তা‘আতিক’।

অর্থ: ‘হে হৃদয় সমূহকে পরিবর্তনকারী! আমাদের হৃদয়গুলিকে আপনার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিন’। [১১]

অন্য হাদীছে এসেছে

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

‘হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর স্থির রাখুন’। [১২]

পরিশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে অন্তরের কঠিনতা থেকে রক্ষা করে সুস্থ অন্তর নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দান করেন-
আমীন।

[১]. মুসলিম, মিশকাত তাহকীক আলবানী, ‘রিক্কাক’ অধ্যায়, ‘লোক দেখানো ও নাম কুড়ানো’ অনুচ্ছেদ হা/৫৩১৪, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৭।

[২]. বুখারী হা/৫২, মুমলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৫৮৮।

[৩]. বুখারী হা/২১০১, মিশকাত হা/৫০১০ তাহকীক আলবানী ‘আদব’ অধ্যায়
‘আল্লাহর জন্য ভালবাসা’ অনুচ্ছেদ।

[৪]. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৮ তাহকীক : আলবানী ‘আদব’ অধ্যায়
‘আল্লাহর জন্য ভালবাসা’ অনুচ্ছেদ; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৯, ৩৭০, ৩৬৮।

[৫]. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪৮।

[৬]. মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ঈমানী দুর্বলতা, (ঢাকা: আল-ফুরকান
প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-২০০৪), অনু: মুহাম্মাদ শামাউন আলী, পৃঃ ৩৬।

[৭]. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৬; তাহকীক : আলবানী, ‘কিতাবুর রিক্বাক’;
রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৪৬৩।

[৮]. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৭ তাহকীক: আলবানী ‘কিতাবুর রিক্বাক’।

[৯]. হাকেম, হা/১৩৯৩; আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

[১০]. আলবানী, আহকামুল জানায়িয, মাসআলা নং ১১৯।

[১১]. মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪৭০, মিশকাত হা/৮৯।

[১২]. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০২।

ভাইদের কাছে কালো পতাকা আইডির একটা অনুরোধ

ইদানিং আমার মাসুল আমার সাথে যোগাযোগ করছেন কারনটা জানতে পারছিনা
আর ভাই আমি অন্তরে কঠিনতা অনুভব করছি আর ভাইদের কাছে নামাজে
মনোযোগী হওয়ার কিছু টিপ্ স চাচ্ছি আমার জন্য দোয়া করবেন মহান আল্লাহ
যেন আমাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন আর আল্লাহ যেন ফোরামের গোয়েন্দা
ব্যতীত সকলের সাথে জাম্মাতে দেখা করিয়ে দেন আমিন নিশ্চই আল্লাহ মুমিনদের
দোয়া কবুল করেন।

পোস্ট টি পিডি এফ আকারে লিংক দেওয়া হলো :-

<http://www8.zippyshare.com/v/gkZmHSZM/file.html>

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৩৯৪>

দিকব্রান্ত জাতির সাথে কেমন হবে আমাদের আচরণ

banglar omor

Senior Member

০৫-০৯-২০১৭

যখন একটি অবুঝ শিশু হাতে কোন ধারালো বস্তু(ব্লৈড) নেয় তখন তার হাত থেকে এটি উদ্ধারের জন্য তিনটি কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

১:ধারালো বস্তুর বিপরীতে আকর্ষণীয় কোন জিনিস শিশুটির সামনে প্রদর্শন করতে হয়।

২:মুখে হাসি এবং শান্ত কোমল আচরণের মাধ্যমে শিশুটিকে দুর্বল করে ফেলতে হয়।

৩:কৌশলে শিশুটিকে তার হাতের বস্তু সম্পর্কে অমনোযোগী করে তুলতে হয়, যাতে করে সে উদ্ধারকারীর উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে।

যদি এর বিপরীতে চিংকার চেচামেচি আর চোখ রাঙ্গানী দেওয়া হয় তাহলে অবুঝ শিশু তার হাতের ধারালো বস্তুটি আরো শক্ত করে চেপে ধরবে।

এতে করে যা হবার তাই হবে।

(উদাহরণ)

যখন তাওহীদে বিশ্বাসী কোন মুমিন বিষাক্ত আকীদাহ বা ভ্রান্ত মতবাদে জড়িয়ে যায় তখন তাকে রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। ভ্রান্ত পথে পা বাড়ানো লোকটি বুঝের দিক দিয়ে কোন অংশেই শিশুর চেয়ে কমনা।

তার ক্ষেত্রেও ভিবিম্ন কৌশল অবলম্বন করা উচিত।

যেমনঃ

তার ভ্রান্ত আকীদাহগুলো প্রকাশের পূর্বে বিশুদ্ধ আকীদাহ তার সামনে তুলে ধরা। যাতে সে নিজেই নিজের ভুল শোধরাতে সক্ষম হয়।

আপনি যদি শুরুতেই তার ভুলগুলো উপস্থাপন করেন তাহলে সে আপনার সহীহটা গ্রহন করবেনা।

#আপনার উত্তম আচরণ ও হামদদীর মাধ্যমে আপনার প্রতি তাকে আকর্ষিত করে তুলতে হবে।

#এমন কিছু কৌশল অবলম্বন করে তাকে ব্যস্ত রাখতে হবে যাতে করে সে তার ভ্রান্ত মতবাদ থেকে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এবং সে বুঝতে না পারে যে আপনি তাকে তার ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করছেন।

তাওহীদবাদী কোন জাতির বিশাল অংশ বা ব্যক্তি যখন ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায় তখন তাদের রক্ষা করার জন্য হাজারো কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তাদের প্রতি সহর্মিতা রেখে তাদের সংশোধন করা আবশ্যিক।

যদি এর বিপরীতে ভ্রান্ত মতবাদে জড়িয়ে যাওয়া জাতি বা ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ, কট্টোরতা, ঘৃণা প্রদর্শন করে বাড়াবাড়ি করা হয় তাহলে ঐ জাতি বা ব্যক্তি ভ্রান্ত মতবাদে আরো মারাত্মকভাবে জড়িয়ে যায়। যেখান থেকে ফিরিয়ে আনা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আর যাদের বাড়াবাড়ির কারণে এই ক্ষতি হবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের ছাড়বেন না।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৬৮৩>